যতনবিবি



যতনবিবি



অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত



সিগ্‌নেট প্রেস

কলিকাতা





দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৫৩
প্রকাশক
দিলীপকুমার গুপ্ত
সিগনেট প্রেস
প্রচ্ছদপট ও ছবি
মাখন দত্তগুপ্ত
মুদ্রাকর
শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
প্রভু প্রেস
৩০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
বাঁধিয়েছেন
বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৫০ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট

দাম আড়াই টাকা

সূচিপত্র

ঘতনবিবি



হান্নিফ বাথানে মোষ চরাতো। মাথায় শিং নেই আর খাড়া পায়ে হাঁটে, নইলে তাকে কেউ পালের থেকে আলাদা করে দেখতো না। কালো কদাকার, কিন্তু শরীর একেবারে পেটা লোহা। চ্যাপটা চোয়াল, বেঁটে ঘাড়, আর মোটা কব্জি। সে যখন কোনো বোকামি করে তখনো লোকে তাকে গরু না ব'লে বলে, মোষ।

মেঘনার মোহানার মুখে হাতিয়া নামে দ্বীপ, স্থির ভূমির থেকে প্রায় ষাট মাইল দক্ষিণে। মোষের রঙের মেঘ নামে আকাশে, উড়ন্ত উড়ুনির মতো 'শর' ছুটে আসে দিকলেশহীন শাদা শূন্যতার থেকে, মুহূর্তে ঢেউ হয়ে ওঠে উত্তাল, ঝড় মাতে আথালি-পাথালি। ফাট ধরে ভেঙে পড়ে বড়ো-বড়ো মাটির চাঙর, সঙ্গে অশ্বত্থ কি ঝাউ, কখনো বা কারু ছাড়া-বাড়ি। ধানবোঝাই নৌকো উলটে যায় মাঝ-নদীতে, লোকজন গরু-বাছুর কে কোথায় ছিটকে পড়ে, বেশির ভাগই আর পার খুঁজে পায় না। হানিফ জলের পোকা, বিশাল বাহুতে ঢেউ পিষে-পিষে উঠে আসে শুকনো চরে—নাম যার চর-জব্বর।

'কি রে, হোল ?' নমাজ শেষ করে হাফ-প্যাণ্টে বেল্ট আঁটতে-আঁটতে সাহেব জিগগেস করে।

'আণ্ডা নেই, হুজুর। কুদ্দুস আনতে গেছে বাজারে।' হানিফ বাবুর্চি-খানা থেকে জবাব দেয়।

নাকের ভিতর দিয়ে সাহেব কি-একটা কঠিন শব্দ করে। সেটা চাপরাশি কুদ্দুসের বিরুদ্ধে না চাকর হানিফের বিরুদ্ধে স্পষ্ট বোঝা যায় না।

সেবার ইনস্পেকটর সাহেবকে হানিফ বাঁচিয়েছিলো নৌকোডুবি থেকে, চর-বৈরাগ্যের কাছ-বরাবর। হানিফ যাচ্ছিলো দই বেচতে, সাহেব যাচ্ছিলো কিসের তদন্ত-তদারকে। বলা-কওয়া নেই, এক ডেলা তুলোর মতো মেঘ ফুটলো আকাশে আর সঙ্গে-সঙ্গে জল ফুটো হয়ে গর্ত হয়ে গেল আচমকা। ধুনখারার বাড়ি খেয়ে সে-তুলো পেঁজা না হতেই, গর্তটা

চক্কর খেতে লাগলো, আর নৌকো তলিয়ে গেল খাড়া একটা লাঠির আকারে। হাতের কাছে যাকে পেল তাকেই সাপটে ধরে হানিফ রওনা হলো পারের সন্ধানে আর সম্বিৎ ফিরে পেতেই দেখলো যাকে সে টেনে তুলেছে ডাঙার উপর, সে ইনস্পেকটর সাহেব।

যদিও সাহেব বলেছিলো সে নিজেই একজন বড়ো সাঁতারু, নিজেরই চেষ্টায় বাঁচতে পারতো সে অনায়াসে, তবু হানিফের মহানুভবতাকে সে অপুরস্কৃত রাখবে না। সামান্য একটা পদক বা খেতাব দিয়ে নয়, দস্তুরমতো মোটা মাশুলে। কি-একটা দলিল কি রদ-বদল করে ক'কানি জমি সে মোকররি করে দিল। শুধু তাই নয়, যদি পিওনি করতে চায়, হানিফ চলে আসতে পারে তার সঙ্গে, সম্প্রতি নোকর-মায়-বাবুর্চি হয়ে। হানিফ শুনতে পেল যেন দূরের ডাক, রুপোর টাকার শব্দ। দেখলো বা চাপরাশের জৌলুশ। ছোট ভাই গফুরের হাতে মোষের দল ছেড়ে দিয়ে সে সাহেবের লাল-ফিতে-বাঁধা ফাইল তুলে নিল বগলে।

কিন্তু জল ছেড়ে কোথায় সে এসে পড়লো এই ডুবজলের দেশে। ভেবেছিলো চারদিকে বুঝি শুধু সবুজের ঢেউ, কিন্তু আশ্চর্য, এ যে আগাগোড়া হাজাশুকার হাবুজখানা। জাগতে-ঘুমোতে সর্বক্ষণ এই ভাতের জন্যে কাতরানি। জবাই-করা পাখা-ছুলে-ফেলা মুরগির মতো চেহারা। একমুঠ ভাত পেলে কাৎ হয়ে যেন শুতে পারে কবরের নিচে।

'কি রে, এলো আণ্ডা ?' সাহেব তাড়া দেয় উপর থেকে।

'এসেছে, হুজুর।'

'পরোটা বানিয়েছিস।'

'জি।'

'দে আমার বাস্কেটে।'

সাহেব মফস্বলে যাবে, জলে হলে নৌকোয়, মাটিতে হলে সাইকেলে। মফস্বলে না হলে আপিসে, আপিস থেকে এসে ক্লাবে বা কোথাও কারু

বৈঠকখানায়। সমস্ত দিন-রাত্রি হানিফ একা। শুনেছিলো সাহেব বিয়ে করেছে নাকি পশ্চিমের কোন উর্দু-কওয়া বিবিকে, বড় ঘর আর ছোট মাইনেতে বনিবনা হয়নি। সাহেবের কি, ছুটি হলেই পালায় কলকাতা, ক্লান্ত হলেই মুক্তি পায় তার বইয়ের আকাশে, কিন্তু একটানা এই শাদা দিন আর কালো রাত্রি হানিফ কি করে কাটাবে? কি করে কাটাবে সে এই হাভাতেদের ভাতের কান্না শুনে?

চাকরিটা পেয়েছিলো সে ভাগ্যিস। নইলে সেও বুঝি আজ সরা হাতে নিয়ে ভিক্ষে করে বেড়াতো, তারো দেশে বোধহয় এই সমান দুর্দশা। এই সমান পেট-পিঠ। পঙ্গপাল আসেনি, মাটিও আফলা নয়, তবু, চড়ুই পাখির জন্যেও এক কণা চাল নেই। তাদের মোষ দিয়েছে বেচে, দলিলের কারসাজিতেও জমিজিরাত রক্ষে পায়নি। হয়তো এমনি করেই লোক কাবার হয়ে যাচ্ছে। মুখ ভার করে থাকবার কোনো মানে হয় না তাই। পেট-ভাতায় কাজ করবার জন্যে কত লোক বসে আছে কাতার দিয়ে। তাই পিওনি না পাওয়ার জন্যে হানিফ নালিশ করে না যেন।

তবু, কেন-না-জানি তার ভীষণ একা লাগে। খিদে মেটে বটে, কিন্তু স্বাদ পায় না। ঘুরছে, অথচ মাধ্যাকর্ষণ নেই, এমন এক পৃথিবী। দলছাড়া।

'তুই যে দিনে-দিনে কাহিল হয়ে যাচ্ছিস।' সাহেব একেক দিন তার খবর নেয়।

'হজম হচ্ছে না, হুজুর।'

'তোর যে দেখছি ভীষণ বাবুয়ানা। লোকে খেতে পায় না আর তুই পাচ্ছিস না হজম করতে।'

'এখানকার জল হুজুর, বোদা, পানসে।'

'আর তোর হাতিয়ার জল তো লোনা।'

হানিফের চোখ চকচক করে ওঠে। বলে, 'সমুদ্রের সোয়াদ।'

সে স্বাদ যেন স্তিমিত হয়ে আসছে তার শরীরে। সাহেব বলে, 'পরিশ্রমের কাজ করবি নে, তাই ডোবায় এসে ডুবেছিস। নে, আজ থেকে মাটি কোপা, ক্ষেত কর। মুলো-বেগুন রো, কপি লাগা।'

সামনে অনেকখানি জমি পড়ে। সাহেব যন্ত্রপাতির জোগাড় দেখে, লাঙল আর মই, হেলা-কোদাল আর দাঁড়-কোদাল। রেক আর খুরপি। হানিফ মুগুর দিয়ে ঢেলা ভাঙ্গে, ঝারি করে জল ছিটোয়। ভাবে, মাটির ফসলে তার কী হবে ?

কে-একটা ভিখিরি মেয়ে এসেছে ভাত চাইতে, হাতে একটা মানের পাতা। তার চোখের দিকে চেয়ে থমকে যায় হানিফ। শুধু যে কাতর তা নয়, কেমন যেন গভীর। দেখামাত্রই দৃষ্টিটা যেন ফুরিয়ে যায় না, খানিকটা উদ্বৃত্ত থাকে। সমস্ত দেহের নৈরাশ্য পেরিয়েও তার চোখে যেন একটু স্বস্তির আভাস।

প্রায় অর্ধ-উলঙ্গ, পচা-গলা একটা ন্যাতা কোনোক্রমে কোমর ও বুকের কাছে জড়ো করে রেখেছে—বয়েস বোঝা যায় না, শুধু চোখের কালোর থেকে যৌবনের অল্প যা অনুমান আসে, নইলে বুকে নেই এতটুকু স্তনলেশ, গা-হাত-পা শুধু হাড়ের লুপ্তোদ্ধার। ধুলো-ঘসা একমাথা রুখু চুল, প্রথমটা দেখলে পাগল বলে মনে হয়। কিন্তু আশ্চর্য, এখনো সহিষ্ণুতা হারায়নি তার লজ্জার সজ্জাবোধ।

বেশ স্থির, স্পষ্টভাবে বলে : 'কিছু ভাত দেবে খেতে ? ভাত !'

যেন প্রতিবাদের অবকাশও রাখে না। খিড়কির কাছে বসে পড়ে, ঝাঁজরা পাঁজরে ধুঁকতে থাকে। বলে : 'নেই কিছু ? অন্তত ফ্যান খানিকটা ? ফ্যানের সঙ্গে ছাড়া-ছাড়া ক'টা শাদা ভাত ?'

জোলা-কৈবর্তের মেয়ে হয়তো, খাবে কিনা তাদের রান্না কে জানে, অবান্তর সন্দেহে হানিফের মন দুলতে থাকে। জিগগেস করে : 'তোমার নাম কী ?'

মৃদু গলায় মেয়েটা বলে : 'যতন বিবি।'

ফাঁপরের পর যেন হঠাৎ বাতাস নেয় ফুসফুস ভরে, হানিফ তার গোটা ভাতের থালাটাই উজোর করে দেয় মেয়েটার মান-পাতায়। রতন নয়, যতন বিবি, যেন অনেক যত্ন অনেক সেবার সে প্রত্যাশী।

সামান্য একটা চাকর—ঠাট কত তার খাওয়ার, ভাতের মধ্যে গর্ত করে-করে ডাল-তরকারি নয়, আলাদা বাটি সাজিয়ে, আর দু দুটো কিনা আস্ত পারশে-মাছ! ভাতের পক্ষপাতের কথা একবার ভাবে হয়তো যতন। কিন্তু সামান্য যে চাকর তারো এই পক্ষপাতটা বা কম কিসে? এই ত্যাগ? আরেক রকম জলে ভিজে ওঠে তার চোখ দুটো।

ভাত নিয়ে চলে যাচ্ছিলো যতন, হানিফ চমকে ওঠে চেঁচিয়ে : 'ও কি, চলে যাচ্ছ যে? খাবে না?'

'এখানে বসে খেতে হবে?' কথায় কোমল একটি টান আনে যতন।

'নিশ্চয়।'

'তোমার সামনে?'

'একশো বার। নইলে ও-ভাত তোমাকে আমি বিক্রি করতে দেব নাকি?'

'বিক্রি যদি করি তবে তো ফের খাবার জন্যেই করবো। আর বিক্রি যে করবো, কিনবে কে?' তবু যতন দাতার মান রাখবার জন্যে চাপটি খেয়ে বসে ঘাসের উপর, গাছের ছায়া দেখে। ছোট গরস পাকিয়ে মুখে তোলে ছোট হাঁ করে, চিবোয় আস্তে-আস্তে, দাঁত দেখা যায় কি না যায়। জিভে ভারি হয়ে ওঠে পাতলা ঠোঁট দুটো, ছোট-ছোট ফেনা লেগে থাকে কশের কাছটাতে, জিভটা বড়শিতে-বেঁধা মাছের মতো ঘুরপাক খায়। চোখে একটি লোভের আবেশ লেগে থাকে।

ঠায় বসে-বসে দেখে হানিফ। পেন্সিলের মতো সরু, শুকনো ডালে বসে কাক একটা কা-কা করে। হাতির পায়ের মতো মোটা চাকার লরি ধুলো উড়িয়ে চলে যায়। পানা-পুকুরে এঁটো বাসনের পাঁজা নিয়ে এসে ও-

পাড়ার কে বউ হঠাৎ ঘোমটা টেনে দেবার জন্যে হাত পায় না। ও-সব কি আজ আর হানিফের লক্ষ্যের মধ্যে। তাকের মধ্যে কাক দেখলেই সে ঢিল ছুঁড়ে মারে, লরি একটা যেতে দেখলে কতক্ষণ পর্যন্ত চোখে কৌতূহল জাগিয়ে রাখে, বেপরদা কোনো মেয়ে-বউ কাছে এসে পড়লে সে নিজের থেকেই সরে যায় ব্যস্ত হয়ে। কিন্তু আজ ও-সব কিছুই দেখবার নয়। আজ দেখছে ও শুধু খাওয়া, কি করে যে খায়, চেটে-চেটে, চিবিয়ে-চিবিয়ে!

শুধু দেখে না, শোনেও। তার নেবার সময় শোনে জিভের শব্দ, চিবোবার সময় দাঁতের, গেলবার সময় গলার। শোনে যেন হঠাৎ-সাড়া-পাওয়া তার রক্তের কুলুকুলু।

খাওয়া শেষ না হতেই উঠে পড়ে যতন বিবি। বলে : 'এ কটা থাক।'

'কেন? ওবেলার জন্যে?'

'এ বেলা জোটে না তো ও বেলা!'

'তবে? কালকের জন্যে? কেন, কালকে আবার এসো।'

'না, এ কটা বাড়ি নিয়ে যাই।'

'কেন, সেখানে কে আছে? বাপ-মা?'

'না, স্বামী।'

হানিফ পাতি-পাতি করে দেখে কতক্ষণ যতনকে। কে জানে কোথায় রয়েছে এর সমর্থন! পুরুষের পূজোয় লাগবে বলে এ-দেহে কোনোদিন আশকারা ছিল বিশ্বাস হয় না।

'ছেলেপিলে হয়েছে?'

আছে না, হয়েছে—প্রশ্নটা নিজেরই কানে কেমন খাপছাড়া শোনায়। যতন চোখ নামিয়ে বলে, 'না।'

স্বামীই যখন আছে তখন সে কেন কোনো কাজ করে না? কাজ নেই তো, নিজেই কেন বেরোয় না ভিক্ষে করতে? স্ত্রীর ভিক্ষে-করা ভাতে নিজের খিদে মেটাবে এই বা কেমন ধারা স্বামীপনা?

যতন যা বলে তা ওর স্বামীরই প্রতি হানিফের সহানুভূতি উদ্রেক করবার জন্যে। হাসানাবাদে আদকদের চালের কলে সে কুলিগিরি করতো, আড়াই-মণী একটা বস্তা তার পায়ের উপর পড়ে—কি করে যে ঘাড়ের উপর না পড়ে পায়ের উপর পড়লো তা কে বলবে—হয়তো, এক মুহূর্তে না মরে পচে-পচে মরবে এই নসিবের খেয়াল। এখন পায়ের হাড় টুকরো টুকরো হয়ে খসে পড়ছে, চারদিকে ভনভন করছে গুয়ে মাছি, দুর্গন্ধে তার সামনে এগোয় এমন সাধ্যি কার? কিন্তু, বলো, তার খিদে পায় তো তবুও। কী হয় যদি সে একটু ভাগ দেয় তাকে?

মড়াখেকো একটা ঘেয়ো কুত্তা ল্যা-ল্যা করে হঠাৎ ছুটে আসে ভাতের দিকে। ক্ষুধায় সেও আজ দুঃসাহসী। যতন খেঁকিয়ে ওঠে, পাতাটা গুটিয়ে নেয় কোলের কাছে। হানিফ একটা ঢিল তুলে নেয় আলটপকা আর সজোরে ছুঁড়ে মারে কুকুরের নাক তাক ক'রে। সিধে লাগে এসে তার লোম-ওঠা ঘায়ের উপর, এখনো পাগল হয়নি বলেই সামনের মানুষকে না কামড়ে চলে যায় ককাতে-ককাতে।

অথচ এই কুকুরটাই এতদিন হানিফের পাতের কুকুর ছিল। শুধু এঁটো-কাঁটা নয়, পরিষ্কার ক'টি আলাদা ভাত দুধ দিয়ে মাখা থাকতো ওর জন্যে। কিন্তু কে জানে ওর ঘাড়ের কাছে অমন জঘন্য ঘা!

তার পরের দিনও যতন ঠিক হাজির, ঠিক ভরদুপুরে, চাকর-বাকরের খাবার সময়। আজ হানিফ চারটি চাল ইচ্ছে করেই বেশি নিয়েছে, এদিক-ওদিক দু-হাতা দুধ হাত-সাফাই করে রেখে দিয়েছে মাটির খুরিতে। একটা মোটা ছেঁড়া বিছানার চাদর চুরি করেছে সাহেবের বোচকা থেকে। ভেবে রেখেছে কাল হাটের থেকে ক'গাছি কাচের চুড়ি কিনে আনবে।

যতনের গায়ের উপর চাদরটা ছুঁড়ে ফেলে হানিফ বলে, 'পরো।'

চাদরটা চিবুকের নিচে জড়ো করে ধরে যতন উছলে-উছলে একটু হাসে। বলে, 'কাল বাড়ি থেকে পরে আসবো।'

ঘেয়ো কুত্তাটা ঘুর-ঘুর করছে আশে-পাশে। হানিফ বলে, 'না, এখুনি পরতে হবে তোমাকে।' বলে সে আড়ালে একটু গা-ঢাকা দেয়। লজ্জার মাঝে লাবণ্যের উল্লেখ আনে।

অনেকখানি কাপড় নিয়ে আগোছালো হয়ে উঠতেই হানিফ স্পষ্ট টের পায় যতনের যৌবন, বুকের উপর আঁচল টেনে দেবার শৃংখলায়, যে-লজ্জা এতক্ষণ ছিল না সে-লজ্জা হঠাৎ গায়ের উপর টেনে-আনায়। অনেকখানি আবরণ পেয়ে বেড়ে যায় তার রহস্য। অনেকখানি যেন অন্ধকার হয়ে থাকে। চট করে কেবল তখন হাড়ের কথাই মনে হয় না।

ঘেয়ো কুকুরটাকে ঘেঁসতেই দেয় না আজ কাছে! কুকুরটারও কেমন যেন সাহস হয় না। যতনকে তারো হয়তো সম্ভ্রান্ত মনে হয়।

দুধ দেখে একটু-বা আশান হয় যতনের। বলে, তার স্বামীর পায়ের ঘা এখন প্রায় গলা পর্যন্ত উঠেছে, চট্‌কে দলা পাকিয়ে দিলেও কিছু গিলতে পারছে না। দুধটা যদি পায়, হয়তো টেনে নিতে পারে দু এক চুমুক।

রঙিন কাচের চুড়ি ঠিক করে রেখেছে, তার পরের দিন, অথচ দেখা নেই যতনের। আর কোথাও আস্তানা গাড়লো নাকি? বিছানার চাদরের বদলে শাড়ি জুটলো নাকি কোথাও?

না, ভোলেনি যতন, অন্তত ভোলেনি তার ক্ষুধাকে। দেরি একটু হতেই হবে আজ। গত রাত্রে তার স্বামী, গরিবুল্লা, মারা গেল, লোক জোটে না মাটি দেবার, কত হাঙ্গামা করে যন্ত্রণা চুকলো এতক্ষণে।

'কাঁদোনি ওর জন্যে?'

'কাঁদবো কেন? বেঁচে গেছে। বেঁচে গেছে ঘায়ের জ্বালা, খিদের জ্বালার থেকে।'

রোজ যেমন, তেমনি করেই খায় যতন, যেন বা অধিকতর তৃপ্তিতে। ভাতে আর তাব ভাগ নেই হয়তো তারি নিশ্চিন্ততায়। আজকের খাওয়া যেন তার আরোগ্যের খাওয়া।

কাচের চুড়ি ক'গাছ এগিয়ে দেয় হানিফ। বলে, 'পরবে নাকি?'
যতন আহ্লাদ করে নেয় হাত বাড়িয়ে, বলে, 'যদি কোনো দিন ফের মানুষ পাই মনের মতন, পরবো সেদিন।'
তার পর থেকে রোজই যতন আসে, সময়ের এতটুকু নড়চড় হয় না। ক্রমে-ক্রমে তার ভিক্ষেটা যেন দাবির চেহারা নেয়। আগে বাইরে ঘাসের উপর বসতো, এখন খিড়কির চৌকাঠ পেরিয়ে উঠোনে এসে বসে। এটা-ওটা চায় আজকাল। বলে, তেল দাও, চুলে জট পাকিয়ে গেছে। দেয় এনে হানিফ, সাহেবের গন্ধ-তেল চুরি করে। বলে, একখানা শাড়ি দাও না, চান করে উঠে পরবো। আপাতত হানিফ তার একটা গামছা দেয়, প'রে স্নান করবার জন্যে। বলে, এক টুকরো সাবান যদি দিতে পারো, চামড়ায় একটু চেকনাই আনি। হানিফ কাপড়কাচা সাবানের থেকে কেটে দেয় এক থাবা।
তার পরে যখন স্নান সেরে খেতে বসে, হানিফের ভয় হয় কেউ না দেখে ফেলে যতনকে। এক নজরে তাকে যেন আস্তাকুঁড়-কুড়োনো ভিক্ষুক বলে মনে হয় না।
বদনা করে জল পর্যন্ত সে চেয়ে নেয়। জল খেয়ে বলে ঘুমো চোখে, 'এখানে থাকতে পেলে মন্দ হতো না।'
কেমন যেন বেখাপ্পা শোনায় কথাটা। হানিফ কাঠখোট্টার মতো বলে, 'না, এখানে কাজ কোথায়!'
সেদিন যতন এসে নতুন রকম নালিশ করে হানিফের কাছে। বেশ পষ্টাপষ্টি ব্যক্ত করে যতন। বলে, এদিকে আসবার সময় কে-একটা লোক হঠাৎ তাকে ডেকেছিলো হাতছানি দিয়ে, এবং কাছে যেতেই পকেটে খুচরো কটা পয়সা বাজিয়ে এমন একটা ইঙ্গিত করেছিলো যেটা অত্যন্ত ঘেন্নার। জামাটা ফতুয়া আর বাজছে যা পকেটে, নিতান্তই টিঙ টিঙ! যতন ঠাট্টা করে ওঠে। কেমন চোখ ঘুরে যায় হানিফের। হঠাৎ দ্রুত, তীক্ষ্ণ আরেক-

রকম চোখে দেখে সে যতনকে। সত্যিই তো, ভোল বদলে গেছে তার চেহারার। গাল দুটো প্রায় ভরা-ভরা, বুকের মধ্যিখানটায় থর ফেলে দুপাশ থেকে প্রায় গোল হয়ে উঠেছে, চলা-বসায় এসেছে অনেক ভার আর গরিমা। পাতা-ঝরা গাছে কখন ফের হঠাৎ ফুল গজায়, কে জেগে তাকিয়ে থাকতে পারে সারাক্ষণ! এক সময় বিস্ময় এসে ধাক্কা দেয় আকস্মিক। তেমনি যেন হানিফ একটা ধাক্কা খায়। নতুন চোখে তাকাতেই যতন হাসে তেরছা করে। হানিফ দেখে তার হাসিতে এখন চাকুর চাকচিক্য।

এ একা হানিফের কীর্তি। পাঁচজনের মাঝে অপচয় না করে সে একজনকে তোয়াজ করেছে। শুধু তাকে খাদ্য দেয়নি, দিয়েছে স্বাস্থ্য, ফিরিয়ে এনেছে তার যৌবন, যা ছিল এত দিন অপাঠ্য, চিহ্নহীন। তাকে দাঁড করিয়ে দিয়েছে সে এখন স্বাধীন দুই পায়ের উপর।

'লোকটা কে?' জিগগেস করে হানিফ।

'দেখিয়ে দেব'খন।' হেসে উত্তর দেয় যতন।

হারান সানা, বেঞ্চ-কোর্টের কেরানি, যতন দেখিয়ে দেয় এক দিন। ঘেয়ো কুকুরটা অনেক আগেই মরে গেছে, কিন্তু হারান মরেনি। ঝোপের ভিতর থেকে, অন্ধকারে, শক্ত একটা ঢিল হারানের কপালে এসে লাগে, যেন মাথার মধ্যে ঢুকে ঘুণ্ডরি পোকার মতো পাক খেতে থাকে। যেন এবার সে হাঁসপাতালে আটক থাকে কিছুকাল, যতনকে হাতছানি মেরে না আর পকেট বাজায়!

এবার যতন চাকরি নিক কোথাও, টেঁস্কেলে বা মটকা-মাচানে। কলে হলেই বা মন্দ কী। এখন তার গায়ে মাংস হয়েছে, হাড়ে এসেছে শক্তি, ডৌল এসেছে পায়ের গোছে, পাছায় আর কোমরে। আর তার হাত গুটিয়ে থাকবার মানে হয় না। ভাতের থালা পাতা আছে বলেই সে হুমডি খেয়ে পডবে সে কী কথা? না, এত লোভ তার ভালো নয়। শেষকালে মুস্কিল হয়ে যেতে পারে।

তবু যতন শুনবে না। পর দিন ফের আসবে ভাত খেতে। রান্নার প্রশংসা করে যাবে।

সাহেবের চোখ এড়াতে পারলেও কুদ্দুসকে লুকোনো যায়নি।

'মুনিবের আর কত লোকসান করাবি, হানিফ ?' কুদ্দুস নালিশ করে।

'সত্যি। খাইয়ে-খাইয়ে নাই বেড়ে গেছে মেয়েটার।' হানিফ যে বিরক্ত হয়ে উঠেছে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। 'দিব্যি ভরা-ভরতি হয়ে উঠেছে, তবু কাজ নেবে না কোথাও।'

'তার শেষ দান যে দেয়া হয়নি এখনো।'

হানিফের চেয়ে কুদ্দুস ঢের বেশি শহুরে, ঘোরালো। কথাটা হানিফ বুঝতে পারে না তলিয়ে। বলে, 'কী আবার চায় সে ?'

'তোকে চায়। তাই চলে যেতে পারছে না।'

সত্যিই বোকা মোষ। অন্ধকার হঠাৎ পাতলা হয়ে আসে, বাতাস হালকা, আকাশ পরিষ্কার। এটুকু কৃতজ্ঞতা, এটুকু প্রতিদান না থাকলে চলবে কেন ? আর কে না জানে, যতন তার নিজের হাতের তৈরি, মাটির পরেকার প্রতিমা ! তার নিজের প্রাপ্য !

'এক দিন এসো না সন্ধেসন্ধি।' শহুরে, ষড়যন্ত্রীর গলায় হানিফ বলে।

যতনের বুক যেন থরথর করে ওঠে। গলা নিচু করে বলে, 'কবে ?'

'তোমার যেদিন ইচ্ছে।'

'কোথায় ?'

কী বলবে কিছু ভেবে না পেয়ে হানিফ বলে, 'নদীর পারে—নৌকোতে।'

পরে হঠাৎ দম নেয় : 'শোনো, সেদিন নতুন ঐ শাড়িটা পরে এসো।'

'আসবো।' এ যেন তার কর্তব্য, প্রায় ভাগ্য বলা যেতে পারে, যতন বলে প্রায় এমনি ভাবেই।

বাঁকা ছুরির মতো চাঁদ-বেঁধা আকাশে, জানানো-শোনানো নেই, যতন এসে হাজির। পরনে হানিফের কিনে-দেয়া খড়কে-ডুরে শাড়ি, গায়ে

ছিটের কাঁচুলি, হাতে সেই কাচের চুড়িগুলি ঝকমক করছে। চলছে যেন নিজেকে বইতে পারছে না।

'চলেছ কোথায়?' হানিফ বোকার মতো হাঁ করে থাকে।

'বা রে, জানে না যেন!' যতন রঙ্গ করে হাসে। ঝাপসা গলায় বলে, 'নদীতে, নৌকোয়।'

বাড়ির পিছনেই মরা নদী, পথটুকু হানিফ শ্রান্তের মতোই পার হয়।

'আমি এমন নেমকহারাম নই। যে আমাকে এতদিন খাওয়ালো-পরালো, যার দৌলতে বেঁচে গেলাম এই মহামারী থেকে, যার পয়সায় আমার এই শাড়ি-জামা চুড়ি-বালা তাকে আমি ফেরাতে পারবো না কিছুতেই।' যতনের গলা কৃতজ্ঞতায় নম্র, আচ্ছন্ন।

ঘাটের থেকে দূরে বাঁধা হয়েছে নৌকো। পারে দাঁড়িয়ে কুদ্দুস, আর নৌকোর মধ্যে গুড়ি মেরে ব'সে স্বয়ং সাহেব।

পা ভিজিয়ে যতন নৌকোয় ওঠে। হাঁটু দুমুড়ে বসে গিয়ে ভিতরে। কুদ্দুস হানিফকে লক্ষ্য করে হাসিতে ভেঙে পড়ে হঠাৎ।

যেন কে যতনকে নিয়ে যাচ্ছে তার আশ্রয় থেকে, তার রক্ষণাবেক্ষণ থেকে, তার হাতে-গড়া মূর্তির ছাঁদ কে বদলে দিচ্ছে রাতারাতি—দিশেহারার মতো হানিফ নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু লক্ষ্য করে, বাহুতে আর তার সেই বেগ নেই, জলেও নেই আর সেই ঢেউ, সেই সমুদ্রবিস্তার।



সরেজমিন



'এই ফার্স্ট ক্লাশ ?'

এই বিস্ময়োক্তিটা ধারা গাড়িতে ওঠবার আগে করেছিলো না গাড়িতে উঠে, ধারারই তা মনে পড়ছে না।

কামরার হাতল ধরে গাড়ির পা-দানির উপর যারা দাঁড়িয়ে ছিল তারাই প্রথম ঠেকালো ধারাকে। ধারাকে ওঠবার জন্যে উদ্যত দেখেও তাদের এতটুকু চাঞ্চল্য নেই। এমনি দাঁড়িয়ে থাকায় তাদের যেন অবিচ্যুত অধিকার।

ঝাঁজালো রোদ, অকারণ লোকশান, সর্বোপরি এই উর্ধ্বশ্বাস ব্যস্ততা—ধারার স্নায়ুগুলো অসম্ভব ধারালো হয়ে উঠেছিলো, শেষে কিনা এই আবার নির্বোধ দ্বাররোধ!

'এরা কি ফার্স্টক্লাশেরও দরজা আটকাবে? কোনোই কাণ্ডজ্ঞান নেই রেল-কোম্পানির ?'

'শুধু দরজা? চেয়ে দেখ ছাদের উপর।' বললে অনিমেষ।

'ফার্স্টক্লাশেরও ছাদে ?' চোখ কুঁচকে ধারা তাকালো উপরে। দুদিকের ঢাল বাঁচিয়ে সারি-সারি বসে গেছে লোক, খালি গায় আর খালি মাথায়। একটু লক্ষ্য করে দেখলো, সবাই তারা পুরুষ, হাতে-পায়ে এখনো যাদের শক্তি আছে; আর পা-দানিতে দাঁড়িয়ে যত মেয়ে আর শিশুর জটলা, যাদের একবার উঠে দাঁড়াবার পর আর হাতল ছাডবার শক্তি নেই।

'এই, নামো, নামো এখান থেকে, পিছনের দিকে গিয়ে দাঁড়াও। এটা বেশি-ভাড়ার গাড়ি।' রেলের কে কর্মচারী এসে প্রবল ভঙ্গিতে তাডা দিলে.

'পা-দানি সব সমান, বাবা।' এক পা পা-দানিতে আরেক পা কবরের উপর এমনি এক বুড়ি বললে প্রায় নিমজ্জমান কণ্ঠে।

'সব সমান, না?' রেলের সেই কর্মচারী হাত ধরে এক হেঁচকা টান মারলো বুড়িকে। করলো একটা মারণোন্মুখ ভঙ্গি। সঙ্গে-সঙ্গে ছত্রভঙ্গ হয়ে কে কোথায় ছিটকে পড়লো। মোলায়েম ভাবে খুলে গেল দরজা।

ভিতরে ঢুকে ধারাকে আবার বলতে হলো সবিস্ময়ে : 'এই ফার্স্ট ক্লাশের ছিরি ?'

গদিগুলি সব ছুরি দিয়ে ফাড়া,নারকোলের ছোবড়া পড়েছে বেরিয়ে, চোখে দেখা যাচ্ছে ছারপোকার সার। ঝাঁট পড়েনি কতকাল, জাম্ হয়ে আছে জানলা, শত টানাটানি-ঠেলাঠেলিতেও ওঠে না একটা, আর যেটা উঠে আছে তাকে নামাও এমন সাধ্য কী !

সেই রেলের বাবুটি বললে নিচে থেকে : 'তবু তো বৃষ্টি হচ্ছে না ভাগ্যিস। নইলে গাড়ির মধ্যে ছাতা মাথায় দিয়ে বসতে হতো।'

কাটকি-নাটকি জিনিসগুলো গুছিয়ে রাখছে অনিমেষ, হঠাৎ, বলা-কওয়া নেই, ট্রেন চলতে শুরু করলো। ঘণ্টা বাজলো না, সিটি দিলো না, সবুজ নিশান বা উড়লো কিনা কে বলবে!

'এ কি, ছেড়ে দিলে নাকি ?' বোকার মত মুখ করে অনিমেষ বললে।

'তুমিই জানো।' ধারা এমন একখানা মুখ করলো যেন সমস্ত দায়িত্ব অনিমেষের।

'না, না, সান্টিং করছে হয়তো। যাবার আগে হুইসল অন্তত একটা দেবেনা ?'

'দম থাকিলে তো দেবে।'

'বা রে, সত্যই তো। দস্তুরমতো স্পিড দিচ্ছে যে। তা হলে কী হবে ?'

আতঙ্কের আভাস পেয়ে ধারা একটু-বা নড়ে উঠলো : 'কেন, কী হলো ?'

'টিকিট কাটা হয়নি যে এখনো।'

'যা গাড়ি তার আবার টিকিট ! খাঁদা নাকে আবার নৎ !'

এটা কোনো সদুত্তর নয়। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রেলের বাবুটির দেখা পাওয়া গেল। অনিমেষ জিগগেস করলে হতবুদ্ধির মতো : 'গাড়ি চললো নাকি সত্যি ?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।' নিতান্ত নিরাসক্তের মতো বললে সেই রেলের

লোক : 'তখনই আমি বলেছিলাম স্টেশনমাস্টারকে যে স্টেশনের ঘড়ি আপনার পনেরো মিনিট ফাস্ট। গার্ডেরো এমন দুর্দশা, সে তার ঘড়ি মেলাতে গেল এই ঘোড়ার সঙ্গে। যা খুসি তাই চলেছে মশাই এ-লাইনে। কোনো চারা নেই।'

'অথচ তখন থেকে কী তাড়াটাই না আমাকে দিচ্ছ! খেয়ে-দেয়ে উঠে শান্তিতে যে এক গ্লাশ জল খাবো তারো পর্যন্ত সময় দিতে তুমি রাজি নও।'

'তবু তাড়া দিয়েছিলুম বলে গাড়িটা ধরতে পারলে। নইলে—'

কী দুর্গতিই না তাদের হয়েছে স্টেশনে আসতে। কোথায় বাড়ি, কোথায় স্টেশন, এক মেরু থেকে আরেক মেরু। একটা ঘোড়ার গাড়ির ভাড়া এগারো টাকা। তাও, মাঝপথে এসে বলে কিনা, গরমে ঘোড়ার মাথা ধরেছে, আর চাইছে না এগোতে। তখন আবার গাড়ি বদলাও। চলতি গাড়ি নেই কোথাও, আড়গড়া পিছনে। গাড়ি যদি বা মেলে, দূরত্বের অনুযায়ী ভাড়ার অনুপাত মেলে না। বেরিয়ে যায় আরো সাড়ে তিন টাকা। এখন আবার টিকিট না-কাটার দরুন কত গুনগার দিতে হয় ঠিক কী।

'ধরো, ধরো, পড়লো, পড়লো—' ধারা হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো।

কী ধরবে, কে পডলো, কিছু স্পষ্ট অনুমান করতে না পেরেই অনিমেষ দরজাটা খুলে ধরলো, যে পাশটা লক্ষ্য করে ধারা উঠেছিলো চেঁচিয়ে। ফার্স্ট ক্লাশ বলে ভাগ্যিস দরজাটা ভিতরের দিকে খোলে, নইলে যে বা না পড়তো তাকে ঠেলে ফেলে দিতে হতো বাইরে। আর, মুমূর্ষুর কাছে অম্লজানের মতো, এই সামান্য স্থানবিস্তার যেন এনে দিলে ওদের চোখে ক্ষণভোগ্য একটি আরামের আশ্বাস।

'পড়েছে নাকি কেউ?'

'পড়তে-পড়তে সামলে নিয়েছে।'

অনিমেষ চেয়ে দেখলো, এবং ঝাপসা-ঝাপসা চিনতে পারলোও হয়তো,

সেই বুড়ি ; কিম্বা, কে জানে, ক্ষুধা আর বার্ধক্য যখন একসঙ্গে এসে মেশে তখন বোধ হয় সব মুখকেই এক রকম মনে হয়।

ও-পাশের দরজার লোকেরা তাকালো করুণ চোখে, একটু বা যেন ঈর্ষাকাতর চোখে। বিচারটা ঠিক হলো না এমনি একটা অভিযোগের ভঙ্গিতে।

"এই যাবি, যাবি প'ড়ে। হাতল না পেয়ে শেষে কি তুই আমার কোমর ধরে দাঁড়াবি নাকি ?" কে একজন বলে উঠলো ও-দিক থেকে।

অগত্যা ও-দিকের দরজাও খুলে দিলো অনিমেষ। ঢুকলো বেনোজল। ঘোলা আর পঙ্কিল।

'এই ফার্স্ট ক্লাশ ?' আরেকবার বলতে চেয়েছিলো ধারা, কিন্তু কেন কে জানে, পারলো না বলতে।

তবু স্ত্রীর একটা অন্তর্দাহক অসম্মতি কল্পনা করেই অমিমেষ বললে, 'একটু হয়তো কষ্ট হবে আমাদের, কিন্তু মনে হচ্ছে ওদের কষ্টের থেকে এখনো কিছু দূরে আছি আমরা। মনে হচ্ছে ওদের ফেলে রেখে একা-একা চলে যাবার অধিকার আর আমাদের নেই।'

'নেইই তো।' ধারা তার ভঙ্গিটাকে নরম, একটু-বা সরস করে আনলো : 'আমরাও ওদের মতো বিনি-টিকিটের প্যাসেঞ্জার।'

নিজেদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তাকালো এবার তারা সেই ভাসমান জনতার দিকে। ভাসমান অথচ আপাতগতিহীন। যেদিকে জলের তোড় ঠেলে নিয়ে যায়, তলে কি বিতলে, চোখে-মুখে সেই সর্বসমর্পণের শূন্যতা। এখানে যে উঠে বসবার তাদের অধিকার নেই, নেই সেই বিচারবোধের স্থৈর্য ; যদি কেউ বা এখন নামিয়ে দেয় তাদের গায়ের জোরে, নেই বা তার প্রতিবাদের প্রস্তুতি। উঠতে হয় উঠেছে, নামতে হয় যাবে নেমে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চেতন এমন নিরুদ্দেশ তাদের মুখভাব। এমন অনির্ণীত।

কে এরা, কোথায় যাচ্ছে, কেনই বা যাচ্ছে, জিগগেস করবে কিনা একবার চিন্তা করলো অনিমেষ। আভাসে তো বুঝতেই পাচ্ছে যে কণ্ট্রোলের দোকান থেকে চাল কিনে বাড়ি ফিরছে যে-যার, প্রায় সবারই আঁচলে দু-চার মুঠ চাল বাঁধা—তবু এটুকু পরিচয়ই যেন যথেষ্ট নয়, এ ধূসর, অস্পষ্ট পরিচয়। এত কাছে বসেও তাদের থেকে অসম্পৃক্ত থাকতে হবে এই বা কেমন নিষ্ঠুরতা ! আর নিষ্ঠুর না হয়েই বা উপায় কী, যখন দুঃখের প্রতিকার করার তার সাধ্য নেই।

তবু ওদের চক্ষুই বারে-বারে জিজ্ঞাসু করে তোলে। যেন বলে, কণ্ঠস্বরটাও আমাদের একটু শোনো।

'তোমরা বুঝি বাড়ি ফিরে যাচ্ছ সব ?'

'এখনো যাচ্ছি বাবু—' কে যেন বললে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে রেখে।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, বাড়ি আছে ওদের। হয়তো খড়ের কিম্বা গোল-পাতার ঘর। হয়তো এখনো ফলে কিছু পালানের তরকারি। হয়তো স্বামী কিম্বা ছেলে এখনো জন পায়, জমিদারের কাছারিতে মাইনদারি করে। 'এখনো যাচ্ছি—' মানে আর দেরি নেই, শিগগিরই কলকাতার ফুটপাতে গিয়ে শোবো।

ঐ ছোট্ট মেয়েটি কখন থেকে উসখুস করছে। সঙ্গে চাল নেই, চলেছে সে তার মা'র খোঁজে। আজ সাত দিন ধরে কলকাতার কোন রাস্তায় গাড়ি-বারান্দার নিচে আস্তানা গেড়েছে, সে, তার মা আর বাবা। পাতের উচ্ছিষ্ট কখনো-কখনো তাদের হাতে পড়ে, তারি প্রলোভনে। কিন্তু কাল রাত থেকে তার মা'র দেখা নেই। কেউ বলে, থালায় করে বেশি করে ভাত আনতে গেছে ; কেউ বা বলে, ছেঁড়া কাপড় গলায় বেঁধে ঝুলে পড়েছে কোন গ্যাসপোস্টে। বাবা তাকে খুঁজছে অলি-গলি, সে ঢুঁড়তে বেরিয়েছে তার গ্রাম। কেউ কাউকে না বলে-কয়ে। বাপে মেয়েতে কোথায় যে ফের দেখা হবে তার ঠিকানা নেই।

'চিনে যেতে পারবে না সেই গাড়ি-বারান্দায় ?'

'কি করে চিনবো ? গাড়ি-বারান্দা কি একটা ?'

'তবে মরতে চলেছ কেন গ্রামে ?'

'পরশু বিশাই-বাবার পূজো, মা যদি ফেরে সেই কথা মনে করে।'

বিশ্বকর্মার পূজো করতো এরা, ঘট বসিয়ে, আলপনা একে। আলপনার জন্যেও মিলতো এদের চালের গুঁড়ো। জাতে কুমোর, হাতের ঢেউয়ে ঘুরন্ত চাকে গজিয়ে উঠতো কত ভাঁড়-কুঁড়, হাঁড়ি-কুঁড়ি। হাঁড়ি ঠনঠন করতে লাগলো, ভাঁড়ে এসে ভবানী অধিষ্ঠিত হলেন। আরেক কে কুম্ভকার এখন চক্র ঘোরাচ্ছেন।

না, বেশি দূর নয়, সাত-আট মাইলের মধ্যেই তারা নেমে যাবে। অনেক কষ্ট দিল তারা বাবুদের। আর যাই কষ্ট হোক, যেন ভাতের কষ্ট কেউ না পায়। যেন পেট না কারুর খোলে পড়ে, যেন কেউ আঁত-শুকনো না হয়।

এর মধ্যে কে-একটা অন্ধ উঠেছে ভিক্ষে করতে। শুধু লাঠির সাহায্যে। অথচ ঠিক পথ চিনে হাত পেতেছে এসে ধারার কাছে, ডাকছে তাকে মা-ঠাকরুন ব'লে।

'কি করে বুঝলে যে আমি বাবা-ঠাকুর নই ?' ধারা ঝলসে উঠলো।

'মা গো, গন্ধে আমরা টের পাই।' অন্ধের গলা কেমন বেধে গেল হঠাৎ।

'এখন তো কতই বলবে। যাও, হবে না কিছু। যারা ভণ্ড, জোচ্চোর, জেনেশুনে তাদের আমরা ভিক্ষা দিই না।' ধারা শাড়ি গুটিয়ে আঁট হয়ে বসলো।

'মাগো, জোচ্চোর জেনে না দাও, ক্ষুধার্ত জেনে তো দেবে।' অন্ধ লাঠি ঠুকে এগিয়ে এলো এক পা : 'আমার খিদে তো আর জোচ্চুরি করছে না।' বলে সে তার জামা তুলে পেটটা উদ্ঘাটিত করে ধরলো।

পেটে-পিঠে এক যদি কিছু থাকে তো এই। খোঁড়লটা যেন একটা বিকট মুখব্যাদানের মতো। শুধু তাই নয়, পেটের পেশীগুলো তোবড়ানো, এক-সঙ্গে কুণ্ডলী-করা। বললে ভিখিরি, 'আমার চোখ ভণ্ড হতে পারে, কিন্তু বলুন, আমার এই পেটটাও কি ভণ্ড? এও কি বলছে না এতদিনে সত্য কথা?'

গাড়িটা এসে দাঁড়ালো এক ইস্টিশানে।

'আর চোখ সত্যিই দেখবে, মা?' বলে দুহাত দিয়ে টেনে ধরে ভিখিরি উন্মোচন করে দেখালো তার চোখের তারাহীন বোবা শুভ্রতা।

এর মধ্যে জানালার বাইরে আরো অনেকে ছেঁকে ধরছে ধারাকে। পালক-ছিঁড়ে-ফেলা পাখির বাচ্চার মতো কঙ্কালায়িত শিশু কোলে নিয়ে একটি নারী। কোলের স্পর্শ-টুকুও সইতে চাচ্ছে না এমন ক্ষীণ। সদ্য-সদ্য মরে-যাওয়া ছেলেকে পাশে নিয়ে কাঁদছে আরেকটি মা, আসন্নসত্ত্বা, পরবর্তী সন্তানের কথা ভেবে। নিজের স্তনলেশহীন বুকের দিকে তাকিয়ে। বস্ত্রহীনতাকে ঢাকবার জন্যে পাগল সেজেছে কে আরেকটি ঐ স্ত্রীলোক। গায়ে ধুলো মাখছে, মাথার চুল ছিঁড়ছে, আর থেকে-থেকে ভেসে উঠছে লজ্জার কাতরতা, ভিক্ষা চাওয়ার ঔৎসুক্য। অপরে যদি বা বলছে ভিক্ষে দাও আমাকে দেখে, এ বলছে, ভিক্ষে দাও আমাকে না-দেখে। আমার এই প্রসাধন না ধরে ফেলে।

একের চেয়ে অন্য অধিকতর। পরের জনকে দেখে মনে হয় আগের জন ঠকিয়ে নিয়েছে, যদিও আগের জনকে দেখে মনে হয় এর পরে আর পর নেই। তা ছাড়া অত রেজকি কোথায়? কাকে দিয়ে কাকে বঞ্চিত করবে? 'পয়সা দিয়ে কী করবো, মা? ওটা তো আর খেতে পারবো না চিবিয়ে। তার চেয়ে কিছু জিনিস দাও, ন্যাকড়ার একটা চওড়া ফালি বা জামার কিছুটা আঁশ। আর যদি কিছু খেতে দিতে পারো মা, কিছু দুধ কিম্বা ফ্যান—'

অলক্ষ্যে সান্ত্বনা পেল ধারা, প্রার্থনার বৈসাদৃশ্যে। ট্রেনে যেতে-যেতে জোগাতে হবে ফ্যান, তারই প্রচ্ছন্ন হাস্যরসে। হঠাৎ দায়িত্বমুক্ত মনে হলো নিজেকে। অনেক নিরুদ্বেগ।

পুরুষেরা দূরে দাঁড়িয়ে আছে, ঘুণে-ধরা বাঁশের চেহারায়। জানে তাদের প্রার্থনার পরিণতি, তাই এটুকু পথ হেঁটে আসবার পরিশ্রমেও যেন শরীরে তাদের সায় নেই। কণ্ঠে যদি কিছু আর্তনাদ থাকে তবে তা মৃত্যুর জন্যে থাকলো, মানুষের জন্যে নয়। খেয়ে-ফেলা ডাবের ফুটোয় কাঠি ঢুকিয়ে কেউ বা শাঁস ঠুকরে খাচ্ছে; পচা বলে ছুঁড়ে-ফেলা খাবারের গা থেকে কেউ বা ধুলো তুলে নিচ্ছে, তাও আঙুল দিয়ে নয়, জিভ দিয়ে; কেউ-কেউ বা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই টলে পড়ছে মাটির উপর।

'কলকাতায় থাকতে বুঝিনি এমন বাইরের চেহারা। দুর্ভিক্ষ আর কাকে বলে! ভিক্ষে করেও যখন পাওয়া যায় না তখনই তো দুর্ভিক্ষ।'

'না, ও-মানে উঠে গেছে অভিধান থেকে।' বললে অনিমেষ: 'যতক্ষণ গাছে পাতা আছে ততক্ষণ দুর্ভিক্ষ নেই, পারে না থাকতে। ওদিকে তাকিও না, তাকাও অন্য দিকে।'

অন্য দিকে। অন্য দিকেই তাকালো ধারা। সোনালি-নীল রোদের দিকে, দিগন্ত পর্যন্ত শ্যামোচ্ছ্বাসের দিকে। দেখেও বিশ্বাস করা যায় না এত ধান ফলছে এ-বছর। কি-রকম একটা প্রচণ্ড প্রহসনের মতো মনে হয়। প্রত্যেক বারই রেলে করে বেড়াবার সময় ধারা তাকিয়েছে এমনি ধান-ক্ষেতের দিকে, কিন্তু কত ধানে কত চাল তার খবর রাখেনি কোনো দিন। এর আগে ধানকে কখনো মনে করেনি ধনশ্রী ব'লে। কোনো দিন নাম জানতে চায়নি সে ধানের, কপোতকণ্ঠী, কালিন্দী বা কনকচুর। উড়াসালি, সীতাসালি বা তুলাসালি। পাতসাভোগ, তিলসাগরী বা রূপনারায়ণ। নামগুলোও কী চমৎকার। হেমন্তের ধান, বর্ষার ধান, গ্রীষ্মের ধান; আমন, আউস আর বোরো। কে আগে জিগগেস করেছে এত কথা?



ধান বোনা আর ধান ভানার ইতিহাস। রাশি-আশি ভারা-ভারা ধান-কাটা কবে সারা হয়ে গেল কে খোঁজ করেছে ? কি-করে ঢেঁকিতে কুটে ধানকে নিস্তুষ করে, কি-করে বা পাটায় আছড়ে ধান ঝরায়, কি-করে বা গরুর পায়ে মাড়িয়ে শীষ থেকে ধান আলাদা করে নেয়, কে খবর নিতে গিয়েছিলো। কি-করে বা পালা দেয়, কাকে বা বলে ধান সারা। কে জানতো খড়ের মাপ পণ আর কাহন, ধানের মাপ আড়ি আব পালি, সর্বোচ্চে বিশ সর্বনিম্ন খুঁচি। কাকে বলে বীজধান, কাকে বা উড়িধান। কে বা চারা, কে বা রোয়া। সব মনে হতো যেন ধান ভানতে শিবের গীত। আজ যেন আরো বেশীদূর তার জানতে ইচ্ছে করে। কার এই ধান, কার জন্যে এই ধান, খলেন-খামার শূন্য করে কোথায় চলে যায় সে জাহাজে ক'রে !

কণ্ট্রোলের যাত্রিরা নেমে গেছে একে-একে, কতক্ষণ একটু ফাঁকা ছিল গাড়িটা, হঠাৎ আরেকটা কী স্টেশন আসতেই দঙ্গলে-দঙ্গলে লোক দুদিক থেকে সমস্ত ট্রেনটাকে আঁকড়ে ধরলো। অনিমেষ বাধা দিল না। বরং নিজের থেকে খুলে দিল দরজা। আগের দলের থেকে এদের আলাদা চেহারা। আগের দল দাঁড়াতে পারতো দুপায়ে, এরা বসে পড়বার জন্যে টলছে সর্বক্ষণ। আগের দলের চাল ছিল, এরা চলেছে ফ্যানের সন্ধানে হাতে পুঁটলি নয়, কলাই-করা বাটি বা মাটির ভাঁড়।

চলেছে এরা লঙ্গরখানায়।

আজকে পালা পড়েছে এদের টিকিটের। এই ইউনিয়নের। ছেঁড়াখোঁড়া কাদা-লেপা টিকিট যেন এদের কাছে সাত রাজার রাজ্য, ভবিষ্যতের আশা, ফ্যানের মাঝে ভাতের অস্ফুট প্রতিশ্রুতি। ফ্যান না পাক, টিকিট যেন খোয়া না যায় এই সবাইর দুশ্চিন্তা। প্রায় যন্ত্রণার মতো।

জাহাজ নোঙর করে দিশি খালাসীরা নেমে যায় বন্দরে, একজোট হয়ে রান্নাঘর চালায় একটা। সেই নোঙরের স্থানে যে রান্নাঘর তারি নাম নোঙরখানা। কিন্তু এদের জাহাজ তো এখনো ফেনিল সমুদ্রে,

নোঙর-ছেঁড়া জাহাজ। তাই লঙ্গরখানা না ব'লে বলা যেতে পারে ফেনাখানা।

'মর্. মর্, প'ড়ে মর্ মুখ থুবড়ে। একটা কেউ পড়ে না কেন কাটা? পা পিছলে সেঁধিয়ে যায় না কেন চাকার তলায়?' বলতে-বলতে বাঁ-হাতে রসিদ-বই ও ডান হাতে একটা কাঠের পেন্সিল নিয়ে টি-টি-আই উঠে এলো। গায়ে বুক-খোলা একটা জ্যালজেলে আলপাকার কোট, কোনো উকিল ভাবা যেত অনায়াসে, কিন্তু আলগা-হয়ে-আসা গোলাকার লোহার বোতামগুলোতেই তার নিশানা। পরনে ছোট-বহরের ধুতি, পায়ে শাদা হয়ে-আসা কালো সেলিম, এক সাইজ ছোট।

গাড়িতে উঠেই তার চক্ষুস্থির। একমাত্র অস্ত্র তার হাতের পেন্সিল, তাই সে চালাতে লাগলো ঐ সব অবাঞ্ছিত যাত্রীদের উপর, অবিশ্যি যারা পুরুষ শুধু তাদেরই খুলিতে আর কপালে। 'আবাব, তোরা উঠেছিস ফার্স্ট ক্লাশে? নেমে যা নেমে যা শিগগির।' এক-আধটাকে জুতোর ডগা দিয়েও সে স্পর্শ করলো।

'আহা, থাক না ব'সে। চলেছে এরা লঙ্গরখানায়।' বললে অনিমেষ।

'লঙ্গরখানা না কারখানায়, যাক যেখানে খুশি। যাদের চাল নেই তাদের চুলোও নেই। তাই বলে এদের তো আর ফার্স্ট ক্লাশে যেতে দিতে পারি না।' টি-টি-আই আবার তেরিয়া হয়ে উঠলো: 'নামলি? যা না থার্ড ক্লাশের পা-দানিতে চ'ড়ে, কিম্বা চাকার সঙ্গে গড়াতে গড়াতে, এখানে মরতে এসেছিস কেন? এই সাহেব-সুবোদের গাড়িতে?' বলে সে আবার পেন্সিল-প্রহার শুরু করলো, আঙুলের গিঁটে আর নাকের ডগায়।

'বাইরে থেকে কে বুঝবে আপনার কোনটা ফার্স্ট আর কোনটা থার্ড!' অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে বললে অনিমেষ।

'গদি-ফাড়া আর গদি-ছাড়া—এই ব্যাটারা সব বোঝে। শয়তানের একশেষ। দেখছেন না, কেমন ধুঁকতে-ধুঁকতে মরে, ধপাধপ মরে না।

ভাত জোটে না, তবু মাড খেয়ে টিঁকে থাকবার মতলোব। হাড় সেঁকে দিলে শালারা। নাম, নামলি ? এবার সব ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করে দেব বলছি। ফার্স্ট ক্লাশ প্যাসেঞ্জারের আমি ককখনো অস্থবিধে ঘটতে দেব না।'

এই কথাটা তাকেই লক্ষ্য করে বলা হয়েছে মনে করে ধারা বললে, 'না, আমাদের কোনো অস্থবিধে হচ্ছে না।'

'আপনারা বললেই তো আর হলো না।' টি-টি-আই রুক্ষ কণ্ঠে বলে উঠলো : 'আরো অনেক প্যাসেঞ্জার জুটে যেতে পারে রাস্তায়। আপনারা আর ওরা মিলে তো সমস্ত গাড়ি রিজার্ভ করেননি।'

কথাটা সত্যি, তবু ওরা যাবে না তাই বা কি করে মেনে নেয়া যায় ?

'চারিদিকে কলেরা লেগে গেছে মশাই, চব্বিশ ঘণ্টার মামলা। কে কখন নোংরা করে ফেলে ঠিক নেই। ঐ তো, ঐ তো ন্যাকারের ওক্ দিচ্ছে ওখান থেকে।'

তবু যেন ওরা জানে না কি করে নামতে হয়!

'কি করে নামতে হয় তাই জানেন না এমন নির্বিকার মুখ। যেমন জানেনও না কি করে মরতে হয় একসঙ্গে। নাম, নাম বলছি।' টি-টি-আই এবার সত্যি-সত্যিই ঘাড ধাক্কাতে শুরু করলো। সব নেমে পড়তে লাগলো চটপট।

গাড়ি তখন চলতে শুরু করেছে অল্প-অল্প। পড়লো একজন মুখ থুবড়ে, টি-টি-আইর বহু আকাঙ্ক্ষার মান রেখে।

'মরেনি, মরলো না এতেও ? উঠে দাঁড়িয়ে দিব্যি ধুলো ঝাড়ছে গা থেকে ? কে বলবে শালা ফ্যান খাচ্ছে আজ পনেরো দিন ? ফ্যানেই যখন এমন ফিনিক ফুটছে শরীরে, তখন শালাদের আর ভাতের দরকার কী!'

তখনো কিছু বাকি থেকে গেছে নামতে। এরা স্ত্রীলোক। কিন্তু গাড়ি তখন দস্তুরমতো চলমান।

'আমার কাছে মশায় 'লেডিজ সিট' নেই—মেয়ে-মদ্দ সব সমান।' ব'লে টি-টি-আই মুখ বাড়িয়ে চেঁচাতে শুরু করলো: 'খান মজলিস! খান মজলিস!' আর, বার কতক চেঁচিয়ে পেন্সিলসমেত হাতটা লম্বা করে বাড়িয়ে ধরলো বাইরে।

অল্পক্ষণ পরেই ট্রেন থেমে যেতে বুঝলো অনিমেষ, খান মজলিশ এঞ্জিন-ড্রাইভারের নাম।

গাড়ি থামতেই নেমে যেতে হলো স্ত্রীলোকদের। থার্ডক্লাশের পা-দানিতে ফের স্থান পেল কিনা দেখবার জন্যে ধারা একবার জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালো। মুখ বাড়াতে সাহস পেলো না, কেননা তার আগেই নজরে পড়লো মেয়েদের মধ্যে কে তার টিকিটখানা ফেলে গেছে গাড়িতে।

'মর্, মর্, মরে না তো ঝপাঝপ। হাড় জুড়োতো তা হলে। আপনাদের কী! সোনার যাদু রায়, দধি দুগ্ধ খায়, তক্তাপোষে ব'সে যাদু ডুগডুগি বাজায়! আর অষ্টপ্রহর এই কণ্ট্রোল আর লঙ্গরখানার ভিড় কণ্ট্রোল করে-করে আমাদের হাড় ভাজা-ভাজা হয়ে গেল। পড়তেন আমাদের অবস্থায়, বুঝতেন তখন ঠ্যালার স্বাদটা। দয়া-মায়া তখন ফুড়ুক-ফাঁই হয়ে উড়ে যেত কোন সাত সমুদ্রের পারে। আর কিসের দয়ামায়া শুনি? এরা কি সব না-খেয়ে মরছে যে মায়া হবে? এরা মরছে নিউমোনিয়া হয়ে, কলেরা হয়ে, হুস ক'রে জ্বর তুলে ধুস ক'রে তলিয়ে গিয়ে। আর আমি যে এই সাতেরো বচ্ছর ধরে পিত্তশূলে ভুগছি, মরছি দিনের পর দিন, মায়া হয় কারুর? ছুটি দেয় আমাকে?'

টি-টি-আই বসলো, যেন অনেক বিশ্রামের যে যোগ্য, অনেক সহানুভূতির। পকেট হাটকে গোটা দুই লবঙ্গ বের ক'রে দাঁতে কাটতে-কাটতে বললে, 'দেখুন তো কটা বেজেছে—আপনার ঘড়িতে?'

'চারটে কুড়ি।'

'পঞ্চাশ মিনিট লেট। এখানে ডিউ ছিলো সাড়ে তিনটেয়। লেট না হয়ে

উপায় কী মশাই ? একধার থেকে ঠেলে তুলুন ও-সব মরা-হাজাদের। সুখ কত ব্যাটাদের, নিখরচায় খাও, নিখরচায় গাড়ি চড়ো, নিখরচায় স্বর্গে যাও। আর আমাদের ?' যেন অনেক কষ্টেই চাপা দিল কথাটা। শুধু সংক্ষেপে বললে, 'সিগারেট ছেড়ে দিয়ে মুখে ঝাঁজ আনছি এখন লবঙ্গ খেয়ে।'

অনিমেষ বললে, 'নিন না একটা।'

টি-টি-আই সিগারেটে এমন ভাবে টান দিল, এমন ভঙ্গিতে, যেন এটুকু না পেলে তার মূর্ছা ঘটতো এক্ষুনি। নেশাখোরের মতো চোখ করে শুধোলো : কদ্দুর যাবেন আপনারা ?'

জায়গাটার নাম করলো অনিমেষ।

টি-টি-আই অনুকম্পার সঙ্গে হাসলো। বললো, 'পৌছুতে-পৌছুতে প্রায় সন্ধে।'

'বলেন কী ? মাইল-পোস্টে তো দেখতে পাচ্ছি বাকি আছে মোটে আর মাইল পনেরো।'

'উপায় নেই। শেষ দশ মাইল ট্রেন কয়লায় যাবে না, যাবে শুধু ধোঁয়ায়।'

'তার মানে ?' ভয় পেল অনিমেষের কণ্ঠস্বর।

'তার মানে ততক্ষণে কয়লা ফুরিয়ে যাবে। যেটুকু ধোঁয়া রেখে যাবে—শুধু সে রেখে গেছে চরণরেখা গো, মলিন স্মৃতিকণা বাসনা-মাখা গো—সেই মলিন স্মৃতির ঠেলাতেই চলবে বাকি রাস্তা।'

'কয়লা ফুরিয়ে যাবে কেন ?'

'যাবে না ? রন্ধনের চাল চর্বণে যাবে না ? স্টেশনমাস্টারদের তা হলে চলবে কেন ? উনুন জ্বলবে কি করে ? হাসছেন, হাসুন, নিজের চোখেই দেখবেন তখন ধোঁয়ার ধুন্ধুমার। আমাদের চলা-না-চলায় তো আপনাদের কিছু আসবে-যাবে না, তাই হাসবেন বই কি।'

অনিমেষ গম্ভীর হলো। এবং সে-গাম্ভীর্য আরো ঘোরালো হয়ে উঠলো

টি-টি-আইর পরের জিজ্ঞাসায়। 'আচ্ছা দেখুন তো, পরের লেভেল-ক্রসিং-এর ধারে নালার উপর মড়াটা এখনো তেমনি পড়ে আছে কিনা।'

মড়া পড়ে আছে! তাকাবে না। ঠিক করেও না তাকিয়ে পারলো না দুজনে। নগ্ন, বৃদ্ধ, অস্থি অবশেষ একটা মৃতদেহ! কিন্তু সত্যি কি সে মরেছে?

'না মশাই, এখনো মরেনি তো! কপালের উপরে যে হাত তোলা, কনুইটা শূন্যে দাঁড়িয়ে।'

'কপালের উপরে হাত তোলা। বলেন কী?' টি-টি-আইও ঝুঁকে পড়লো এদিকের জানলা দিয়ে। 'সত্যিই তো! বড্ড খোস-মেজাজে আছে তো বুড়ো! কাদায় শুয়ে আছে আজ দুদিন, অথচ মরবার নাম নেই এখনো। কায়দা করে হাত তুলে চোখের উপর থেকে রোদ ঠেকাচ্ছেন! যান মশাই, দেখতে পারি না আর এই বাবুয়ানা। নেমে যাই এখান থেকে। দিন, টিকিটটা দেখিয়ে দিন ঝট করে—' টি-টি-আই হাত বাড়ালো।

'টিকিট কাটতে পারিনি, মশাই—যা লাগে—'

টি-টি-আই খানিকক্ষণ হাঁ করে রইলো, প্রায় নিরবয়ব ভঙ্গিতে। পরে ঝুপ করে মেঝের উপর বসে পড়ে দুই হাতে অনিমেষের পা জড়িয়ে ধরলো।

'এ কি, পাগল নাকি আপনি? কই ট্রেন থেকে নামিয়ে দেবেন—'

'না, তার বদলে কিনা মাথায় তুলে নাচছি! পাগল ভাবতে চান, ভাবুন, কিন্তু হাত নিয়ে গোল হবে না আমার। ডান হাত আর বাঁ হাত। আঃ, অনেক দিন পাইনি এমন রাঘববোয়াল, বা মহাশোল বলতে পারেন। ফার্স্ট ক্লাশে ডবলিউ-টি।'

'কত দিতে হবে পেনাল্টি? ভাড়াই বা কত ফার্স্ট ক্লাসের? টি-টি-আইর উল্লাসের কিনারা করতে না পেরে অনিমেষ বললে ভয়ে-ভয়ে।

'পেনাল্টি না হাতি! আমাকেই একটু খাইয়ে দেবেন বড়ো হাতে।' প্রায় নির্লজ্জের মতোই টি-টি-আই বললে, প্রায় গর্বোজ্জ্বল চোখে।

'ও-সব চলবে না মশাই।'

'বা এক কথায় বলে দিলেন, চলবে না মশাই। কিন্তু আমাদের চলবে কি-করে? পোয্যের আন্দাজে চাল নেই, ডাল, কয়লা-কেরোসিন নেই, সিগারেটের অভাবে লবঙ্গের ঝাল খাচ্ছি, আমাদের দিকে একটু ফিরে তাকাবেন না? পেটটা খুলে দেখাতে পারি না বলেই বোধহয় খিদে নেই বলে বিশ্বাস করে নেন? যত মায়া উথলে ওঠে আপনাদের পাঁজরাগুলো গুনতে পেলে, কালো কোটে ঢেকে রাখলেই বুঝি মনে করেন চর্বিতে ডুবে রয়েছে ওরা!' টি-টি-আই সত্যিই তার কোটটা খুলে ফেলবার উদ্যোগ করলো।

'না, আপনার অনটনে অবিশ্বাস করি না।' অনিমেষ বাধা দিল। 'বেশ তো যদি সাহায্য চান, আপনাকে আমি কিছু দিতে পারি, কিন্তু টিকিটের বাবদ যা আমার দেয় তাই নিতে হবে আপনাকে।'

'ভিক্ষে আমি নিতে পারবো না। ভিক্ষে নেব কেন? সবাই যা নেয় তাই নেব!'

'সবাই কী নেয়?'

'ঘুষ।' প্রায় ঘোষণার মতো করে বললে টি-টি-আই: 'শুধু নেয় না, সবাই যা দিয়ে থাকে। রাক্ষসের মধ্যে আপনিই বা কেন রাম থাকতে যাবেন? বেশ তো, একটা রসিদ কেটে দিচ্ছি আপনাকে মাইল দশেকের, আর বাকিটার একটা রফা করে আমাকে কিছু খাইয়ে দিন দয়া করে। আপনার বিবেক আর আমার পেট একসঙ্গেই না-হয় ঠাণ্ডা হোক।' টি-টি-আই আবার কোট খোলবার উদ্যোগ করলে।

অনিমেষ কঠিন হয়ে বললে, 'না মশাই, মাপ করবেন, আমি ঘুষ দিতে পারবো না।'

'আমি নিচ্ছি কিনা তাই ওটাকে ঘুষ মনে হচ্ছে, কিন্তু চুনোপুঁটি ছেড়ে রুই-কাৎলা আর রুই-কাৎলা ছেড়ে হাঙর-কুমীর হলে সেটাকে শোনাতো তখন পারিশ্রমিক, স্পেশ্যাল রেমিউনারেশন। স্পষ্ট করে খোলাখুলি বলে

নিচ্ছি কিনা, তাই জাত গেল টাকাটার, আর চোখ টিপে কাছার দিক দিয়ে হাত বাড়িয়ে নিলেই ওটা সটান স্বর্গে গিয়ে উঠতো। নিন মশাই, স্বাভাবিক মানুষের মতো ব্যবহার করুন, মায়ায়-দয়ায় দুর্বল, লোভী মানুষের মতো—' টি-টি-আই লিখিতব্য রসিদের নিচে কার্বন-কাগজের টুকরোটা ঠিক করে বসাতে-বসাতে বললে, শুধু লঙ্গরখানার দিকেই তাকাবেন না, আমাদের এই হাঙ্গরখানার দিকেও তাকান।' বলে পেটের উপর সে কটা ঢ্যাবঢেবে চড় মারলে। তার পর উঁচালো আবার পেন্সিল: 'টিকিট কাটুন দুটাকা সাত আনার, আর আমাকে দিন না-হয় একটাকা সাড়ে বারো আনা।'

'হবে না মশাই।' প্রায় ধমকের মতো বললে অনিমেষ। 'বাড়াবাড়ি করেন তো রিপোর্ট করবো।'

'তা তো করবেনই। বীরত্ব তা না হলে প্রমাণ হবে কি-করে? আচ্ছা, বেশ,' খাতা-পেন্সিল গুটিয়ে নিল টি-টি-আই: 'বিনে-ভাড়ায়ই ট্র্যাভেল করুন তবে। বিবেকের সন্তোষবিধান করুন।' বলে চলন্ত গাড়ি থেকে কি-কায়দায় নেমে নিমিষে সে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

লঙ্গরখানার যাত্রীদের নামিয়ে দেবার সময় যেমন লেগেছিলো ধারার, এখনো তেমনিই মনে হলো। যেন জোর করে গলাধাক্কা দিয়ে এক ক্ষুধার্তকে নেমন্তন্ন-বাড়ি থেকে বার করে দেয়ার বাহাদুরি।

'আহা, নিলেই হতো য়্যাডজাস্ট করে। কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হতো শুনি। আর সবাই নিচ্ছে না চারপাশে? বেচারি গরিব, কিছুটা আসান পেত নিশ্চয়ই। নিজের চাকরিটার জন্যে কত খাইয়েছিলে উপরওয়ালাকে তা বুঝি এখন আর মনে নেই।' কথা থেমে গেলেও ধারার চোখে জ্বলতে লাগলো তিরস্কার।

অথচ এই স্ত্রীর উপস্থিতিটাই ছিল অনিমেষের ত্রাণ।

'পাপের কথা বোলো না, এই দারিদ্র্য এই অভাবের চেয়ে আর পাপ কী

হতে পারে সংসারে ?' ধারার বক্তৃতার মূলে অবিমিশ্র দরিদ্রের প্রতি দয়া না আর-কিছু, বুঝলো না অনিমেষ। কিন্তু স্ত্রীর ভৎর্সনায়ও সে ভ্রূক্ষেপ করবে না।

নিজে কণ্ঠ ভরে জল খেয়ে না এলেও ফ্লাস্কের কণ্ঠ ভরে ধারা চা নিয়ে এসেছে। তাই সে এখন দু পেয়ালায় ভাগ করতে বসলো। ঘাড় নিচু করে ঝুঁকে খাবার সাজাতে বসলো দু প্লেট। ঘাড়ের উপর বিকেলের রোদে চকচক করে উঠলো তার সোনার হার।

মুহূর্তে কী হয়ে গেল আনুপূর্বিক ঠাহর করা গেল না কিছু। পাইখানা থেকে ভূতের চেহারার একটা লোক এলো বেরিয়ে, কটিবাস মাত্র সম্বল, ঘামে পিছল সমস্ত গা-হাত পা, বেরিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়লো ধারার ঘাড়ের উপর, আর মুহূর্ত মাত্র অপেক্ষা না করে সোনার হারটা ছিনিয়ে নিয়ে দরজা খুলে নির্ভুল কায়দায় নেমে পড়ে চকিতে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রবল প্রমত্ত চেঁচামেচি করতে গিয়ে স্বামী-স্ত্রী কেউ হাত বাড়িয়ে চোরকে ধরতে পারলে না।

গাড়ি থামবার শেকল নেই একটা, জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চীৎকার শুধু সম্বল। মাঝে-মাঝে, 'ও মশাই, খান-মজলিস!'

আর এ-দেয়ালে ও-দেয়ালে শিকল খোঁজাখুজি করতে গিয়ে বারে-বারে আর্তনাদ করে উঠছে ধারা: 'এই ফার্স্ট ক্লাস?'

থামলো অবশেষে গাড়ি। লোকটাকেও পাওয়া গেল। নামতে গিয়ে পা হড়কে পড়ে গিয়েছে মুখ থুবড়ে।

আরো অনেক জিনিস জানা গেল আস্তে-আস্তে। ধারার সোনার হার গলাতে বহাল-তবিয়তেই অধিষ্ঠান করছে। লোকটাকে প্রথমে ভেবেছিলো তারা টি-টি-আইর প্রতিনিধি, এখন বুঝতে পারা গেল, প্রতিপক্ষ। বুঝতে পারা গেল যে সে পাঁজর-গুনতে-দেয়ার দলে। প্রথম থেকেই উঠে বসে ছিল সে লুকিয়ে।

ঘাড়ে নয়, থালায়। থাবা মেরেছিলো সে সোনার হারে নয়, প্লেটের উপরকার ফুলকো লুচির ঢিবির উপর। দুখানা নাকি মুখেও পুরেছিলো গোগ্রাসে, কিন্তু সম্পূর্ণ গেলবার আগেই অজ্ঞান হয়েছে।

'দেখলেন, দেখলেন তো শালার কাণ্ড,' কালো-কোট-পরা সেই টি-টি-আই এলো বেরিয়ে: 'লাফ দিল বুনো মোষের মতো, কিন্তু দাঁত খিঁচিয়ে প'ড়েই রইলো শুধু, ফুসফুস ফেটে টেঁসে গেল না শেষ পর্যন্ত। মুখের থেকে লুচির ড্যালাটা সরিয়ে দিতেই চমৎকার জ্ঞান হয়েছে শালার। এখন একটু ফ্যান পেলেই দিব্যি চাঙ্গা হয়ে উঠে দাঙ্গা শুরু করে দেবে। মরতে কী আপত্তি দেখেছেন ব্যাটাদের?'

গাড়ি আবার ছাড়ো-ছাড়ো।

কী মনে করে টি-টি-আই হঠাৎ চোখ টিপলো অনিমেষের দিকে চেয়ে। পিছনে স্ত্রীর উপস্থিতির সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত থেকেও অনিমেষ চোখ ঠিক না টিপলেও স্বচ্ছন্দে, সহাস্য প্রত্যুত্তরে, একটু ছোট ও কুঞ্চিত করলো।





ধরা বিয়ে

বরযাত্রী এসেছিলো ভক্ত। বঙ্কলালের বিয়েতে। কাজীপাড়ায়।

কাঁসি আর ঢাক, খোলা গ্যাস আর শামিয়ানা, ছেঁড়া পাতা নিয়ে লেড়ি-কুত্তার সঙ্গে পাতিকাকের ঝটাপটি। মালসাতে টিকে-তামাক, সরাতে পান-চুন, কটরাতে চিকি-সুপুরি। কলসী, মুচি, তিজেল, ধুমুচা…

সব আবছা-আবছা। মনের মধ্যে এঁটে আছে শুধু সেই মেয়েটার নড়াচড়া। হেলা-দোলা। আঁচল অসামাল করে ছুটে ছিটকে বেরিয়ে যাওয়া। কখনো ফরসিতে টান মারা, কখনো বা ডাবা-হুঁকোয় ছুঁচলো করে ঠোঁট রাখা। ধোঁয়া ছাড়া। ঘাসের মতো পান চিবোনো। শব্দ করে পিক ফেলা। বারে-বারে নিচেকার ঠোঁট উলটিয়ে দেখা। শাড়ির এখানে-ওখানে পানের ছোপ লাগানো। ফক্কড়, ছ্যাবলা মেয়ে। মনে লেগে আছে তার সেই পান-খাওয়া লাল দাঁতের হাসি, সেই ফচকেমি।

তিন বারের চেষ্টায়। প্রথম বার বাস্ যেখানে দাঁড়ায়, সেখান থেকেই ফিরে গিয়েছিলো। দ্বিতীয় বার বাস্ যখন সোদপুর ঘুরে চলেছে মধ্যমগ্রামের দিকে, তখন। ব্যারাকপুর গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড পর্যন্ত কলকাতা-কলকাতা মনে হয়েছে, কিন্তু যেই সোদপুরের ক্রসিং-লেভেল পেরিয়ে চলেছে মেঠো রাস্তায়, অমনি কেমন ধুকপুকিয়ে উঠেছে বুক। বাঁধকে। নেমে পড়েছে উজবুকের মতো। কিন্তু এবার, তিন বারের বার, সে ঠিক চলে এসেছে উজোন ঠেলে। এই কাজীপাড়া।

নেমে পড়ে মনে হয়, এসেছে কেন? কেমন ফাঁকা-ফাঁকা, নতুন-নতুন লাগে। অচেনা-অচেনা। সব ভুলে গেছে, কোথায় সেই পানের বরজ, সেই রামধন-চাঁপার গাছ। ভোলেনি শুধু সে চাঁপাগাছের টকটকে হলদে ফুল, ভোলেনি সেই পান-খাওয়া লাল দাঁতের হাসি।

যদি কোনো ফাঁকে দেখা হয়ে যায় সেই হাসির সঙ্গে।

আসা-যাওয়ায় বাসে-ট্রামে মোটমাট প্রায় তিন টাকা খরচ। কত খুঁটে-খুঁটে এই টাকাটা সে জমিয়েছে। কত চুরি-চামারি করে।

'কত্তা,' কাকে সে ডাকে, 'এই গাঁয়ে তুমি থাকো ?'

'হাঁ, কেন ?'

'কী করো তুমি ?'

'জমিদারের তৈনিতি।'

'চলেছ কোথায় ?'

'তাগাদায়।'

'সুধন্য পালের বাড়ি চেন ?'

'চিনি বৈকি। সরাসর রাস্তা, চলে যাও সিধে। গোঁসাই মণ্ডল, সারদা কুলে, পরেই সুধন্য পাল।'

ঠিক। সেই রামধনচাঁপার গাছ। দূরে সেই স্থলপদ্ম। শাদা ফুল লাল হয়ে এসেছে।

ঘুরঘুর করছে। ছোঁকছোঁক করছে। তাকাচ্ছে ইতি-উতি। ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ। ধারে-কাছে কোথাও একটুও ছায়া নেই।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায় ভূতের মতো ?

সেই ছটফটে চুলবুলে মেয়ে এতক্ষণ ধরে গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে এই-ই বা কে ভাবতে পেরেছিলো ? কেনই বা যে থাকবে না তার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং তাই তো স্বাভাবিক।

'কে ওখানে ?'

'আমি।'

'বাড়ি কোথায় ?

'বড়শে—পশ্চিম-বড়শে।'

'সে কোথায় ?'

'বেহালা-বড়শে।'

'ও বাবা! তা এখানে কি ?' বাড়ির ভিতর থেকে কে-একটা লোক বেরিয়ে আসে।

'বেড়াতে এসেছি।'

'কার বাড়ি ?'

'বাড়ি নয় কারুর, এমনি।'

লোকটা তাকিয়ে থাকে তার মুখের দিকে। যেন ছাঁচে ফেলে হাতের আদরে গড়েছে সে মুখ। টানা চোখ, টিকলো নাক, টাটকা স্বাস্থ্য। বয়েস একুশ-বাইশের বেশি নয়। খালি পা, খাটো ধুতি, বুক-খোলা আধা-শার্ট।

'নাম কী ?'

'ভক্তদাস পাল।'

পাল ? হ্যাঁ কুমোর সে। বাপ-মা কেউ নেই, মামার আশ্রয়ে থাকে। মামার নাম উত্তম পাল। হ্যাঁ, চাক ঘুরোয় সে। তার হাঁড়িকুঁড়ির ব্যবসা। মামার সে ডান হাত।

'তুমিও চাক ঘুরোও ?'

'ঘুরোই বৈ কি। জাত-ব্যবসা।'

'কী গড়ো ?'

'সব গড়ি। হাঁড়ি, কলসী, খুরি, গেলাস, প্রদীপ, কলকে—গাঁজার আর গড়গড়ার—তেলের বাটি, ছোপা হাঁড়ি, দোয়াত—সব। তা ছাড়া হাতের কাজ মেয়েরা করে—সরা, মালসা, হাঁড়ি-কলসীর তলা—চাবড়ার মাটি দিয়ে…'

বুকের রক্ত চনচন করে ওঠে। কিন্তু কে জানে মন্ত্রবলে মনের কথা জেনে নিয়ে চালাকি করছে কিনা। তাই খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জিগগেস করে ভিতরের খবর, ছোটখাটো বিবরণ।

না, হটে না ভক্তদাস।

আল-ওয়ালা মেশেল! চারহাতওয়ালা চাকা। শিলপিঁড়ির উপর বসানো। শিলের ত-র উপরে। পাকা আগা-বাঁশের লাঠি দিয়ে তৈরি চাক-নলি। চাকের মাথায় ছানা-মাটির মুঠম-হাত গাছ বসিয়ে থাবড়ে-থাবড়ে সমান

করা। চাকের বিঁধেয় নলি ঢুকিয়ে বনবনিয়ে পাক খাওয়ানো। যাকে বলে নক্ষত্রবেগে ঘোরা। কাছেই পেনোর হাঁড়ি, আনিকানি সমান করবার জন্যে বাঁশের ফাঁপের উঁচো। আলগোছে কেটে নেবার জন্যে কলমের আগার মতো স্ঁচলো চিমড়ি। সেই কেমন দুই হাতে ভামুর করে আনা, কাঁকড়ামুঠো হয়ে কানা তৈরি করা। হাত লাগিয়েছ কি, অমনি দলাছলা হয়ে গেছে। তারপর—

হটে না ভক্তদাস।

সন্দেহ কি, কুমোর, কুমোরের ছেলে।

হঠাৎ জিগগেস করে লোকটা : 'বিয়ে করবে ?'

'বিয়ে ? কাকে ?' ভক্ত যেন মজা পায়।

'আমার মেয়েকে।'

যেমন ঝাকড়-মাকড় চুল, পাগল ঠাওরায় ভক্ত। বলে, 'তোমার মেয়েকে বিয়ে করবো কেন ?'

'টাকা দেব।'

'তা, তোমরা কুমোর তো ?'

'কুমোর বৈ কি। আলমান গোত্র। তা, জাত-ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছি।'

'কী করো তবে ?'

'চাষ করি। বিলেন জমি আছে। বরজ আছে পানের।'

'অনেক টাকা করেছ বুঝি ?'

'তা মেয়ে বিয়ে দেবার মতো আছে কিছু মাধবের আশীর্বাদে।'

'কিন্তু মেয়ে কেমন ? কালো কিটকিটে নিশ্চয়ই ?'

লোকটা হঠাৎ ডাক পাড়তে শুরু করে : 'দিব্য, ও দিব্য, ও দিব্যি—'

ঘরের ছাঁচের নিচে দাঁড়ায় এসে একটি চোদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ে। দাঁড়িয়ে আছে যেন কাঁপছে, ফেটে পড়ছে। চুল খসা, শাড়ি বেগোছ। শুধু মুখে লেগে আছে হাসি আর দুই ঠোঁটের ফাঁকে পান-খাওয়া সেই লাল দাঁত।

ভক্তের বুকের মধ্যে হামানদিস্তের ঘা পড়তে থাকে। যাকে চকিতে একটু চোখের দেখা দেখবার জন্যে চলে এসেছে বিরানা জায়গায়, তাকে শুধু দেখে চলে যাওয়া নয়, বিয়ে করে গাঁটছড়া বেঁধে বাড়ি নিয়ে যাওয়া, এ যেন দেহে বসে কল্পনা করা যায় না। আজগুবি গাঁজাখুরি গল্পেও এমন কথা শোনেনি কেউ।

'কেন বাবা?' মেয়ে এগিয়ে আসে কয়েক পা।

'এই আমার মেয়ে, দিব্যমণি।'

দিব্যমণি। চন্দ্র-তারার সামিল।

ভক্তর চোখ জড়িয়ে আসে। মুখোমুখি তাকাতে পারে না।

'কে এই ছোঁড়াটা বাবা?' গলা বাড়িয়ে চিবুক তুলে জিগগেস করে দিব্যমণি।

'তুই যা বাড়ির ভেতর।'

'বয়ে গেছে। আমি এখন দলুইদের ঢেঁস্কেলে ধান এলাতে যাচ্ছি।' বলেই দে-ছুট।

ভক্তদাস গড় হয়ে প্রণাম করে সুধন্যকে। মুখ কাঁচুমাচু করে বলে, 'আপনাকে আমি চিনতে পারিনি।'

'কিন্তু আমি চিনতে পেরেছি গোড়াতেই। দেখেই মন ডাক দিয়ে উঠেছে এ একেবারে আপন হবার জন। কি, রাজি, বিয়ে করবে? পছন্দ হয়?'

চোখ নামিয়ে ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে ঝুরো মাটি খুঁটতে-খুঁটতে ভক্ত বলে, 'আমি কী জানি?'

'কে জানে?'

'মামা জানে।'

তখুনি লোক চলে যায় পশ্চিম-বড়শে, রুয়েডাঙায়। উত্তম পালের বাড়ি। লোক যায় সুধন্যর ভাই সৃষ্টিধর আর মান্দার কেনারাম ঢুয়ারী। সঙ্গে টাকা দিয়ে দেয় সুধন্য। রাহা-খরচ তো বটেই, দরকার হলে দাদন পর্যন্ত।

যেমন করে হোক উত্তমকে যেন নিয়ে আসে ধরে। যেন মেয়ে দেখে যায়। যেমন করে হোক। ছাড়াছাড়ি নেই।

ভক্তকে আটকে রাখে। যেতে দেয় না। বলে, 'আসুক তোমার মামা। লোক গেছে আনতে। তার মুখের হাঁ-না আদায় করে তবে অন্য কথা।'

নাক-বেঁধা পশুর মতোই নিজেকে মনে হয় ভক্তর। যা বলে তাই করে। গায়ে রগরগে করে তেল মেখে এঁধো পুকুরে স্নান করে। মাড দিয়ে বাড়িতে-কাচা ফর্সা কাপড় পরে। খেতে বসে। জীবনে এত সব খাওয়া দূরে থাক, দেখেনি এক থালায়। ঝিঙেপোস্ত, বকফুলের বড়া, সরপুঁটির ঝাল, ঘুসো চিংড়ি দিয়ে কাঁচা আমড়ার টক। এক তিজেল পায়েস।

খাওয়ার পরে পান। ভেবেছিলো এবার অন্তত দিব্যমণিকে দেখা যাবে। কিন্তু কোথায় উধাও হয়েছে কে জানে।

দলিজঘরের মাচার উপরে শুতে হয় তারপর। ঘুমুতে। খিড়কি দিয়ে মেয়েরা মফস্বলে যায়। সেদিক পানে জানলা। শুয়ে চেয়ে থাকে। কিন্তু দিব্যমণিকে দেখে না।

ভরাপেটের ঘুম। সন্ধের ঘাটে এসে ঠেকে। স্বপ্নের মতো মনে হয় এই সন্ধের আবছায়া।

কাটে রাত। নির্জীব অন্ধকারে।

পর দিন পয়লা বাসেই চলে আসে উত্তম। সঙ্গে পাড়ার কাঙ্গাল বর আর বাসুদেব পান্তি। চলে আসে টাকার গন্ধে, আরো টাকার গন্ধে। চোখে দস্তকী দেনদারের যত ভয় তার চেয়ে বেশি কাটকবুল মহাজনের কাঠিন্য।

'আসুন, আসুন, গরিবের কুঁড়েঘরে পায়ের ধুলো পড়েছে আপনার—'

সুধন্য আতিথ্যে নেতিয়ে পড়ে। কোথায় বসতে দেবে, কী খেতে দেবে— তার সব তালগোল পাকিয়ে যায়।

আড়ে-ওড়ে কান পেতে থাকে ভক্ত। বিটকেল গোঁফে মামার মুখের চেহারাটা কেমন সদয় মনে হয় না।

‘এমনি আড়কাটির কাজ চলে নাকি আপনাদের এদিকে?’

‘তা যা বলেন! কিন্তু এমন ছেলে পেয়ে হাতছাড়া করতে মন ওঠে না। এমন চালাক-চোস্ত ছেলে—’

‘কিন্তু মেয়ে আপনার শুনেছি তো কাণামেঘ—’

‘তা একবার দেখুন না তাকে।’ বলেই সুধন্য ডাক দেয় দিব্যমণিকে।

দিব্যমণির পাত্তা নেই।

‘হলোই বা না মেয়ে আপনার ডানাকাটা পরী, তাতে কী? শুনছি মাটির কাজের পাটই আপনাদের লোপাট হয়ে গেছে। তবে ঐ মেয়ে নিয়ে আমার লাভ কী? না পারবে মাটি হাতিয়ে কাঁকর বাছতে, না বা লাথিয়ে-লাথিয়ে মোলায়েম করতে। মোটা দানার বালিতে পা পিষে-পিষে পা খেয়ে যাবে না, পায়ে শুধু আলতা পরে থাকবে এমন বউয়ে আমার দরকার নেই।’

‘উলটে তাই তো টাকা দেব আপনাকে। বাপ-মা নেই, ভাই-বোন নেই, ভক্তকে আমি ঘরজামাই করে রাখবো। দিয়ে দেব দু’দশ বিঘে জমি। পানের বরজ।’

‘বা, বেশ আছেন খুশমেজাজে। বেল পাকিয়েই খুশি, আবাগে কাকের কথা ভেবে আর কী হবে? এতদিন ধরে কোলে-পিঠে করে মানুষ করলাম যাকে, তার থেকে এই আমার নিটমুনাফা? যাক, ফিরতি বাস কতক্ষণ পরে-পরে আসে? কই রে ভক্ত?’ উত্তম হাঁক পাড়ে হেঁড়ে গলায়, ‘আয়, আর আটকে থাকতে হবে না তোকে।’

ভক্তর বুকের ভিতরটা ঢিপ-ঢিপ করতে থাকে। মামা তা হলে একা যাবে না, তাকে সুদ্ধ নিয়ে যাবে। ইচ্ছে করে ঘাপটি মেরে থেকে নিঃসাড়ে সেও গা-ঢাকা দেয়।

কোলে পিঠে করে মানুষ করেছেন! ছায়ায় পর্যন্ত লাথি মারেন, এখন তার দরদ দেখ না! কোনো দিন খেতে-মাখতে পেল না। কোনো দিন

দেখতে পেল না ভালো পয়সার মুখ। মুখ খেতে-খেতে জীবন গেল। এখন ন্যাকা-বুঝুতে এসেছেন। থাকবেই তো এখানে। পানের বরজ করবে।

শুধু খাটিয়ে মারা চৌপহর। নিয়ে আয় কোথায় আছে আঠুলে মাটি। নিয়ে আয় বাইন, পাকা তেঁতুলের কাঠ। নিদেন, জঙ্গলের কাঁচা গাছ। নেলকাদা দিয়ে খোল ল্যাপ্। পোন পোড়া রাত ভরে, ইটের ঝিঁকের উপর হাঁড়ি বসিয়ে। অল্প-অল্প করে তাওয়া। নইলে ফেটে যাবে হুড়ুম-হাড়ুম করে। পরে তেজ বাড়া। খোলের মধ্যে জ্বলতে দে দাউ-দাউ করে। দেখিস আগুনের বে-তদবিরে একটা কানাও যেন না ফাটে। তারপর আঙরটানা দিয়ে আগুন বার কর। জাবখাওয়া গামলা দিয়ে মুখ ঢাক যাতে ধোঁয়া না ভিতরে যায়…

উঃ, সে কী বে-আক্কেল খাটনি!

না, যাবে না সে আর রুয়েডাঙায়। হাত দিলে ঝুরিয়ে যায় এমন রসা দো-আঁশ মাটিতে কচা পুঁতে পাটকাটির ভিতরে খড দিয়ে বেডা বেঁধে সে পানের বরজ করবে।

'কই রে ভক্ত, এলি?'

ঘাড় মোটা করে ভক্ত চুপ করে থাকে।

জেদ করে হবে না কিছু। হবে না তার একার জোরে। মামা রাজি না হলে সব ঘুঁটিই কেঁচে যাবে। তার তো আর দেবাংশে জন্ম নয় যে হাত বাড়িয়ে চাঁদের নাগাল পাবে!

চারে মাছও এলো, টোপও গিললো, কিন্তু মাছ গেঁথে খেলাবার সময় ডোর গেল ছিঁড়ে।

কাটান-পেঁচ আছে সুধন্যর সুতোয়। সৃষ্টিধর দিতে চেয়েছিলো আরো একশো, সুধন্য বাড়িয়ে দিল তিনগুণ। তাও রাজি হলো অনেক ধস্তাধস্তি অনেক হেস্তাহেস্তিতে। জানেনা ভক্ত তার মামাকে? পাকা হাড়, ঝুনো

শয়তান। মাছ সাঁতলাবে তো তেল দেবে না। পিঁপড়ের গা টিপে-টিপে গুড় বার করবে।

আরো আছে লোয়াজিমা। বারবরদারী, আভ্যুদয়িকের খরচ, জাতকুটুম খাওয়ানোর খরচ—তার মানে আরো একশো।

ধরা বিয়ে যখন—সুধন্য তাতেই রাজি।

কখন যে মামা দিব্যমণিকে দেখে পছন্দ করে কে জানে! পানপত্র লেখা হয়, সাক্ষী হয় কাঙ্গাল আর বাসুদেব, পাড়ার মুরুব্বি-মাতব্বর। তরশুই দিন আছে বিয়ের।

তবু না আঁচালে বিশ্বাস নেই।

খেয়ে-দেয়ে বিকেলের বাসেই যাবে না-হয় ভক্তদাস। ঘরজামাই যখন, তখন এখন থেকে শিকড় গেড়ে বসলেই বা ক্ষতি কী! ট্যাঁকে টাকার টিপলির উপর হাত রেখে উত্তম বলে, বলতে পারে সহজে।

কিন্তু মান তো আছে। তাই খেয়ে-দেয়ে ভক্ত ফিরবে। ফের আসবে চলন করে।

যাবার আগে আরেক বারটি দেখা যাবে না দিব্যমণিকে?

এ-কোণ ও-কোণ ঘোরে। উঁকি-ঝুঁকি মারে। তাকায় ঘাড় ঘুরিয়ে। কিন্তু দিব্যমণি উবে গেছে, গন্ধটুকুও টের পাওয়া যায় না। যেন বিয়েটাই স্থির, মেয়েটা স্বপ্ন!

তবু ফাঁকে চলে আসে মাঠের মধ্যে, ভেড়ির উপর দিয়ে। চলে আসে পানের বরজে।

শুনেইছে এত দিন, ভিতরে ঢোকেনি কখনো। পোনের আগুন নয়, নরম ছায়া-করা। গরানের ছিট আর লটা আখের মতো পেতেনের ডগা কেটে লাগিয়ে তার উপরে চাল ছেয়েছে, কেশেবন আর সরু খড়ে, লম্বায়-আড়ে চটা ফেলে। মিঠে-মিঠে রোদের আভা। লতা ডগিয়ে-ডগিয়ে যাচ্ছে নলের গা বেয়ে, গাঁটে-গাঁটে পান। ভক্তদাস চেয়ে থাকে অবাক হয়ে। ফুল

নেই ফল নেই মূল নেই— কেবল পাতা। কোনোটা তকতকে, কোনোটা বা বাতি। দু'এক পিল ভেঙে নিয়ে গেছে হয়তো। ইচ্ছে করে ছিঁড়ি একটা—

'কে রে ছোঁড়া ? কী করছিস এখানে ?'

ভক্তদাস চমকে চেয়ে দেখে দিব্যমণি। ভুরুদুটো বিরক্তিতে বাঁকা চোখ-দুটো রাগ-রাগ। কিন্তু মুখের মধ্যে তেমনি পান ঠাসা। ঠোঁটের সীমানা ছাড়িয়ে পানের ছোপ তেমনি চলে এসেছে গালের এলেকায়।

যেন ফাল্গুনে হাওয়ায় ডগার মাথা ফেড়ে নতুন পল্লব গজাচ্ছে—এমনি মনে হলো ভক্তর। বলে 'পানের বরজ দেখছি।'

'কেন, তোর কুমোরের চাক কি আর পাক খাচ্ছে না ?' দিব্যমণি ঢুকে পড়ে বরজের মধ্যে।

ভক্তর চোখে খুশি উপচে ওঠে। 'বা, আমি যে এখন পানের চাষ করবো।'

'কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখিয়েছে বুঝি। মারা পড়বি বলছি। তাঁত বুনে খাচ্ছিলি, তাই খা, কেন এঁড়ে গরু কিনতে যাবি ? ভালোয়-ভালোয় বাড়ি পালা।'

ভক্ত ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। তার চোখের খুশি ঢিমিয়ে আসে।

'বোস্ এখানে।'

ঘাস নেই, আগাছা নেই মাটির উপর চাপটি খেয়ে নিজেই আগে বসে পড়ে দিব্যমণি। ভক্তদাসও বসে, দূরে-দূরে ভয়ে-ভয়ে।

দিব্যমণি খেঁকিয়ে ওঠে: 'কেন এসেছিস এখানে ? বিয়ে করতে ? আমাকে বিয়ে করতে ?'

'আমি তার কী জানি ?'

'তুই বিয়ে করবি, আর তুই জানিস না! ঐ কেলেকিস্কিন্দেটা তো তোর মামা ? ঐ কুঁদিকাটা মুষকি জোয়ান ? যে টাকা নিয়ে গেল ? হাম-হাম করে খেয়ে গেল থাবা-থাবা ?'

'তোমার বাবা যদি বিয়ে দেন তো আমার মামার দোষ কী ?'

'বড়সড় হয়েছি, বাবা আমার দেবেনই তো বিয়ে। কিন্তু তুই করবি কেন? তুই কি আমার যুগ্যি?'

ভক্তদাসের মুখে কোন কথা জুয়ায় না।

'তুই তো একটা বাঁদর। মুক্তোর মালা গলায় পরতে এসেছিস। চিনিস ঐ সাঁতরা-বাবুদের ভাগ্নেকে? কলকাতায় তালতলা না নেবুতলায় থাকে, কলেজে পড়ে, মোটরে করে হাওয়া খেতে বেরোয় কত বড়লোক, কাত্তিকের মতো চেহারা। তার কাছে তুই একটা কী! চিলের কাছে গঙ্গাফড়িং।'

'তা তোমার বাবাকে গিয়ে বলো না—'

'বাবা তো নয়, তালুই।'

'কেন, তোমার মা মারা গেছে নাকি?'

'মা যদি মারা না যাবে তবে কেউ এমনধারা বিয়ে দেয়? খোঁজ নেই, খবর নেই কোথাকার কে-একটা অজাত-কুজাতের ছেলের হাতে এক কথায় মেয়ে দেয় গছিয়ে? আমি কি উড়ো খই যে গোবিন্দায় নমো করে দিলেই হলো?'

'সাঁতরা-বাবুর ভাগ্নের সঙ্গে তো আর তোমার বিয়ে হয় না!'

'তাই তোকে বিয়ে করতে হবে, না? কী আমার আব্দার! তুই যে চ্যাটায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখিস!'

না দেখে উপায় কী, এমনি অসহায় অগাধ চোখে চেয়ে থাকে ভক্তদাস। দিব্যমণি একটু ঘনিয়ে আসে। বলে, কথায় যেন কোথায় একটু মিনতির সুর 'দ্যাখ্, আমাকে বিয়ে করে তোর কিছুই লাভ হবে না—'

লাভ-লোকসান খত খতেনের ভক্ত কী জানে!

'কোনো কাজই জানি না আমি কুমোরের। আমি না পারবো মাটি হাতাতে, না-বা লাথাতে চেপে-চেপে। কাকে বলে সরা কাকে বলে মালসা, কাকে হাঁড়ি কাকে তিজেল, আমি কিছু জানিনা।'

'আমি এখন পানের বরজ করবো।'

'তোর মাথা করবি। ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ করবি। পানের তুই জানিস কী, হতভাগা? ক'রকম পান, তাই জানিস?'

'গাইতে-গাইতে গায়েন হবো।'

'কচু হবি। গোলাপের যেমন তোয়াজ লাগে তেমনি লাগে পানের। পারবি তুই তোয়াজ করতে? জানিস কি করে কাপি আর মুটে পুঁততে হয়? নল থেকে নাবিয়ে এনে মাটিতে লতিয়ে দিতে হয়? সরষের খোল গুঁড়ো করে চেলে দিতে পারবি গোড়ায়-গোড়ায়? বর্ষায় জলে বসে ভিজে জোঁকের মধ্যে পারবি তদবির করতে? ছাখ্, ফেন দিয়ে ভাত খাচ্ছিস তো খা, গল্পে দই মারিসনে।'

'তুমি শিখিয়ে দেবে।'

'কী বুদ্ধি রে তোর বলিহারি! বরজের মধ্যে মেয়েরা আসে নাকি কোনো দিন? বরজ অশুদ্ধ হয়ে যায় না?'

হ্যাঁ, ভক্ত শুনেছে বটে এমন কথা। যেমন কুমোরের মেয়েরা চাক পারেনা ছুঁতে।

'তবে তুমি এসেছ কেন?'

'আমি মানিনা ওসব। তা ছাড়া, তোকে ধরতে হবে তো নিরিবিলিতে।'

দিব্যমণি আরো এগিয়ে আসে। বলে, 'শোন, কলার ভেলা করে সমুদ্র পার হতে যাসনে, কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। সরে পড় সময় থাকতে। নইলে ভালো হবে না।'

'নইলে কী হবে?'

'নইলে দেখিস আমিই সরে পড়বো।'

'সাঁতরা-বাবুদের ভাগ্নের সঙ্গে?'

'যার সঙ্গেই হোক না কেন, উটকোমুখো, তোর সঙ্গে নয়।'

'বেশ তো, টোপর মাথায় দিয়ে যাবো, আবার খালি-মাথায় উঠে আসবো।'

'তবু তুই যাবি, হতভাগা?'

'বিয়ে ঠিক হলে যাবো না? জমি বিলি হয়ে গেলে যাবো না দখল নিতে?'

'যাস, তাই যাস তুই। বুঝতে পাচ্ছি, লাঠিপেটা না হলে তুই নড়বিনে এখান থেকে। খাবি কোঁৎকা?'

'অদৃষ্টে থাকে খাবো।'

'পচা আদার ঝাল বেশি। কিন্তু শোন, তোকে বলে রাখি খাঁটি কথা, তোকে আমার একটুও পছন্দ হয় না, মনে ধরছে না, তোকে আমি ভালোবাসতে পারবো না একরত্তি!'

'ও রকম মনে হয় প্রথম-প্রথম।'

এ একেবারে পাথরে কোপ মারা।

এবার দিব্যমণি দস্তুরমতো গা ঘেঁসে গায়ের গরম দিয়ে বসে। বলে ফিস-ফিসিয়ে, 'এবার তবে বলি সত্যি কথাটা—'

এতক্ষণে ভক্ত সত্যি-সত্যি ভয় পায়। দিব্যমণির মুখ-চোখে কেমন একটা অন্ধকার ফুটে ওঠে।

'ঐ পানটা দেখছিস?'

'কই?'

ঐ যে। হলদেটে হয়েছে, ছিটছিট দাগ পড়েছে। দেখছিস?'

'হ্যাঁ, দেখছি।'

'ঐ পানটা দুষে গেছে। শোন তবে কানে-কানে, আমিও তেমনি দুষে গেছি।'

ভক্তর গা অজানতে শিউরে ওঠে। 'যাঃ, কী যে বলো!'

'না, কী যে বলো নয়, সত্যি। তা না হলে অমন রাস্তা থেকে বর ধরে এনে বিয়ে দেয় সাত-তাড়াতাড়ি? সত্যি, আমি অত্যন্ত খুঁতে, খারাপ মেয়ে। জিগগেস কর গিয়ে বাড়ি-বাড়ি, আমার কেচ্ছায় পাড়ায় কান পাততে পারবিনে।'

'যাঃ, বিশ্বাস করি না।'

'ভিটেমাটি চাটি হয়ে যাবে তোর। ঘুঘু চরবে। একবার যখন একটা কেলেঙ্কারি করেছি তখন আরো যে না করবো তার ঠিক কী? বিয়ে করছিস, মেয়ের খোঁজ নিবিনে? জিগগেস করবিনে পার্টি-বেপার্টির লোককে?'

'খোঁজ করে কতটুকুই জানতে পারবো বা?'

'তবু যে মেয়ে দুষে গেছে, যাতে দাগ ধরেছে, তাকে তুই বিয়ে করবি?'

'উপায় কি না করে?'

'উপায় নেই?'

'নইলে দোষ তোমার ঢাকবো কি-করে?'

'আমার দোষ ঢাকতে তুই বিয়ে করবি? তুই কি পাগল না মুদ্দফরাস?'

'তা ছাড়া গোড়ায় ঠিক্ খোল দিলে পানের দোষ খণ্ডে যায়। ঝাল পান ফের মিঠে হয়ে আসে।'

'তোর মাথা হয়ে আসে। শেষকালে তুইই কপাল চাপড়াবি। সাধ করে বেনো জল ঢোকাসনে।' দিব্যমণি উঠে পড়ে: 'মুখের পান ফুরিয়ে গেছে, থাকতে পাচ্ছি না আর। তবু শেষবার বলে যাচ্ছি, ভালো চাস তো পাত্তাড়ি গুটো, মানে-মানে সরে পড়। নইলে এক কেলেঙ্কারির পর আরেক কী কেলেঙ্কারি বাধে, তুই ভাবতেও পারবি নে।' আঁচলে ঘূর্নি দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে যায় গেট দিয়ে।

সারাটা রাত ভক্তদাসের কাটে কেমন একটা বুক-চেপে-ধরা বোবা হাঁপের মধ্যে। বুকে যতটা নিশ্বাস নেয় ততটা যেন ছাড়তে পারে না। যতটুকু আশা নেয় তার চেয়ে ভয়ই বেশি জুড়ে থাকে। ভয়ের ভাপ।

কিছু একটা যে ঘটবে তাতে সন্দেহ নেই। পাঁচ আঙুলেই ঘি—এমন মোলায়েম পরিণামে বিশ্বাস হয় না। হয় ফাটবে মাথা নয় ভাঙবে ঠ্যাং। সাঁতরা বাবুদের ভাগ্নের সঙ্গে সে যে কিছুতেই এঁটে উঠবে না তা কে না জানে। হয়তো ফাঁদে ফেলবে, নয় গায়েব হয়ে যাবে। কে জানে, হয়তো সাঁতরা-বাবুদের ভাগ্নের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত বেরিয়েই যাবে দিব্যমণি। হয়তো

বা স্থধন্য পালের মনই চলবিচল হয়ে যাবে। হয়তো মামা আসবে না। ভজকট—ভণ্ডুল হয়ে যাবে। কী যে হবে কিছুই আঁচ করতে পারছে না। কিন্তু বুঝতে পারছে সর্ষের ভিতর থেকে ঠিক বেরিয়ে আসবে ভূত। তবু চলে যেতে মন ওঠে না। চোখের ভালো-লাগাটা মুছে দিতে ইচ্ছে করে না নিজের থেকে চোখ বন্ধ করে।

সকালে উঠে বাড়ি-ঘরে লক্ষ্য করে না একটু ব্যস্ততা। আকাশে-বাতাসে যেন বিয়ে-বিয়ে রঙ নেই। তাকে জায়গা দিয়েছে লাগোয়া সারদা কুলের বাড়িতে, বাইরের ঘরের হাতনেয়। পুরুত এসেছে তার তদারকে। তবু ভয়-ভাঙা হতে পারে না। কুমোরের বিয়ের কাণ্ড-কারখানাই বা কী, তবু ততটুকুও যেন সোর-সরাবত নেই! মনে হয় না দিব্যমণি তার বাড়ি আছে লক্ষী মেয়ের মতো। নিশ্চয়ই বেরিয়ে গেছে রাত থাকতে, হাঁটা-পথে, নৌকোয়, গাড়িতে।

তবু কী আশা করে যায় সে পানের বরজে, দুপুর বেলায়। আওতায় ধান হয় না, অথচ পান হয়েছে কেমন। তবু রোদের ঝাঁজে কোথাও-কোথাও লতা কেমন জুমরে গেছে, ঝিমিয়ে পড়েছে।

পিছনে খসখস করে ওঠে। যা ভেবেছে, বা যা মোটেই ভাবেনি, দিব্যমণি। যেন কী চক্রান্ত তার চোখে, চিবুকে, তার চুপিচুপি চলায়। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে। ঠোঁটে মনে হয় পানের লাল নয়, রক্তের ছোপ। হাতের ইসারায় বসতে বলে ভক্তকে। যেখানটায় ভক্ত বসে, সেখান থেকে আরো দূরে সরে যেতে ইসারা করে, যেখানে আরো একটু আবডাল। মন্ত্রমুগ্ধের মতো ভক্ত একবার এখানে বসে, আরেকবার ওখানে, পাতার থোপনার আড়ালে।

কাছে এসে বসে প্রায় কোলের কাছে। বলে, 'আমি জানি কেন তুই যাসনি এখনো। বেশ, তাই, ট্যা-ফোঁ করতে পারবিনে কিন্তু,—বুঝলি?' বলে ভক্তর হাত চেপে ধরে।

ভক্ত কিছুই বোঝে না।

চোখে ঝিলিক মেরে বলে দিব্যমণি, 'চুমু খাবি তো? চুমু খেলেই তো হবে? খা না—যটা তোর খুসি। আমার মুখে খুব মিষ্টি পান। নে, শিগগির, সাঁটে সেরে নে চট করে। তারপর বাড়ি পালা।'

ভক্ত হাত ছাড়িয়ে নেয় আস্তে-আস্তে, আঙুলের প্যাঁচ থেকে আঙুল খুলে খুলে। বলে, 'না।'

'না কি? নে, রাখ্ নেকরা করিসনে।'

একশোবার বললে একশোবারই না—ঐ এক উত্তর।

'তোকে কি কাটলেও রক্ত নেই, কুটলেও মাংস নেই?'

'না, তা হয় না।'

দিব্যমণি যেন ঘুসি খায় উদ্যত থুতনির উপর। যেন ঠেলা খেয়ে পড়ে যায় এক পাশে। বলে, 'তবে কী চাস তুই হনুমান?'

'আমি বিয়ে চাই।'

'আমাকে চাসনে?'

'চাই।'

'তবে?'

তবে, কি করে বোঝায় ভক্তদাস!

'কেন, বিয়ে করে তুই কি সন্নেসী হবি নাকি?'

'তা কি জানি!'

'তবে আমাকে তুই এই কচু পাবি। আমি চললাম তবে মরতে।' দিব্যমণি এলো আঁচলে চলে যায় আঁকাবাঁকা পায়ে।

পর দিন বিয়ের দিন।

বিয়ের দিন না রায়ের দিন। কাঠরায় যেন আসামী এসে দাঁড়িয়েছে, শুধু রায় জানবার জন্যে। খালাস না জেল। বিয়ে না বাউণ্ডুলে!

হয়তো এখুনি শুনবে দিব্যমণিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, পাওয়া যাচ্ছে না

সাঁতরা-বাবুদের ভাগ্নেকে। হয়তো এত্তেলা দিতে গেছে থানায়। দিব্যমণি যে বলে গেল মরতে যাচ্ছে তার মানে জলে ডুবে মরতে যাচ্ছে না নিশ্চয়ই। আশ্চর্য, ভাবতেও পারতো না ভক্ত, আভ্যুদয়িকের কাজ হবে, তারপর আসবে কিনা মামা, দুজন জ্ঞাত-কুটুম নিয়ে, গয়ারাম আর বারাণসী। বাজবে ঘণ্টা-কাঁসর, ধরবে পোঁ। আস্তে-আস্তে জমায়েৎ হবে লোকজন। আরো আশ্চর্য, ডাক পড়বে তার শামিয়ানার নিচে, বিয়ের আসরে।
'যা দিনকাল, সব সাঁটে সেরে নিতে হবে ক্ষমাঘেন্না করে।' কে বলে মেয়ে-পক্ষ থেকে।
সমস্তই কি সংক্ষেপ? দ্রুত? কোনোখানেই নেই কি ঢালাও অবসর, আভাঙা আলস্য?
এও কি সত্য বলেই ধরতে হবে? ঐ যে কনে এসে বসলো তার পিঁড়িতে। কোল-কুঁজো হয়ে। লাল চেলিতে। ঝোঁকানো মাথায় ঘোমটা দিয়ে। ঠিক দিব্যমণিই তো? খটকা লাগে। অনেক যেন কাহিল, ডিগডিগে। নিস্তেজ। যেন ঢলকে পড়েছে অনেকটা। রোদ-লাগা পানের লতার মতোই জুমরে ঝিমিয়ে পড়েছে। কে জানে, হয়তো আর কেউ। তেমন নয় তার বসবার ছাঁদ, কাঁধের ডৌল। এ অনেক ভদ্র, অনেক ঠাণ্ডা। অনেক ধীর, অনেক মৃদু। কোলের উপর হাত দুখানি রেখেছে যেন ভিক্ষার মতো।
ঠিক। এমনি করেই প্রতিশোধ নিয়েছে দিব্যমণি। আরেকটা কোনো মেয়ে দিয়েছে বদলি করে। নিজে সটকান দিয়েছে, আর তার বদলে পাঠিয়ে দিয়েছে একটা কে ফিকে জোলো পানসে মেয়ে। মামার কী! মামার তো টাকা পেয়েই খালাস। মেয়ে দেখেওনি হয়তো। কিম্বা হয়তো আরো মূলে আছে ষড়যন্ত্র। হয়তো সুধন্যই দিব্যমণিকে দেখিয়ে পার করছে তার কৃষ্ণমণিকে।
পান-খাওয়া দাঁতে দিব্যমণির লাল হাসিটা দেখতে পাচ্ছে যেন সামনের

আলোতে, দূরের অন্ধকারে। কী ধড়িবাজ মেয়ে! তার বিয়ের সাধ মিটিয়ে দিয়েছে ষোল আনা। খোঁড়াকে ঠিক সে টেনে নিয়ে এসেছে খালের মধ্যে। এখন ঢাকী সুদ্ধ বিসর্জন।

কার বদলে কে। নাকের বদলে নরুন! পানের বদলে মুখশুদ্ধি। ঠিক হয়েছে। কাঙালের ঘোড়ারোগ হলে এমনই হয়।

মুখচন্দ্রিকা। মেয়েটার চোখ বোজা। ঠোঁট দুটো ফ্যাকাসে, মেটে মিনমিনে মুখ। চিনি-চিনি অথচ চেনা যায় না। আস্তে-আস্তে চোখ তোলে মেয়ে। চাউনিটা মনমরা। দেরি হয় না চিনতে। দিব্যমণিই।

দিব্যমণিই কি সত্যি?

দেখতে দেখতে ধোয়া-পাখলা হয়ে পাট উঠে যায় বিয়ের। বাতি যায় নিবে। বর-কনে শুতে যায়।

ঘোলা রাত। ময়লা ময়লা জ্যোৎস্না। ঝিঁঝিঁ ডাকে। তেঁতুল গাছে বসে ডাকে একটা ভুতুম।

বিছানায় উঠতে ভক্তর পায়ে দিব্যমণির পা ঠেকে যায়। দিব্যমণি অমনি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে।

ভক্ত ভাবে, খুব একটা ঠাট্টা হয়তো। কিন্তু দেখে দিব্যমণির মুখে নরম গাম্ভীর্য।

গ্যাসের আলোয় যা দেখেনি এখন দেখতে পায় মিটমিটে জ্যোৎস্নায়। দিব্যমণির ঠোঁট শাদা, শুকনো। দাঁত দেখা যায় না। একটাও পান খায়নি সে আজ।

'এ কি, পান খাওনি?'

অনেকক্ষণ পর ধরা-গলায় দিব্যমণি বলে, 'না আজ আমার উপোস। আমার বিয়ে।'

এ কি দিব্যমণি কথা কইছে?

'কিচ্ছু খাওনি তাই বলে?'

'না। বিয়ের দিন মেয়েদের কিছু খেতে হয় না।'

'খেলে কী হয়?'

'পাপ হয়। খেতে নেই।'

'তুমি তো ও-সব মানো না।'

'না, মানি। এখন মানি।'

'পান খেলে না কেন?'

'পান সমস্ত পূজোয় লাগে, সমস্ত শুভকাজে লাগে। আজ তা খেতে হয় না।'

'কাল থেকে?'

'দু একটা খাবো। বেশি খাওয়াতে শ্রী নেই।'

এ কি দিব্যমণি কথা কইছে?

ভক্ত যতক্ষণ না শোয় ততক্ষণ দিব্যমণিও বসে থাকে এক কোণে। মুখ ফিরিয়ে। আঙুল করে চাদরের কোণ খোঁটে। যত না রাগ তত লজ্জা। যত না ঘৃণা তত ভক্তি।

অনেক সাহস করে ভক্ত হাত ধরে। হাতটা কি রকম টান, লম্বা হয়ে থাকে। ছাড়িয়ে নেয় না, ঢেলেও দেয় না। শুধু ছেড়ে দিয়ে বসে থাকে।

হাত ছেড়ে দেয়। 'শোও, বসে আছ কেন?' বলে ভক্তদাস।

হাত আবার নিজের কাছে রাখে। 'তুমি আগে শোও।'

এ কি দিব্যমণির কথা?

দিব্যমণিকে শোয়াবার জন্যেই শুতে হয়। শুয়েই কেমন কুঁকড়ে লুটিয়ে পড়ে। মনে হয় যেন মুছে গেছে, ধুয়ে গেছে। দুঃখে, লজ্জায়, পরাজয়ে। ধরা-দেয়ার চাইতেও ধরা-পড়ে-যাওয়ার লজ্জায়। অনেক বলে ফেলেছে অনেক খুলে দিয়েছে তারি অনুতাপে। জলে ধুয়ে-ধুয়ে পড়ে আছে একটা ধার-ক্ষয়া গোলালো পাথরের ঢিপি।

ভবতোষ চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেল, আত্মহত্যা। আত্মহত্যা ছাড়া কোনো পথ নেই সমাধানের। পরাজয়-মোচনের।

সমস্ত রাত ছটফট করেই তার কাটতো, যদি না শেষ রাতের দিকে চাঁদ উঠতো পীত-পাণ্ডু। চাঁদ দেখে তার আশা হলো একবার, এই বুঝি আকাশ ছিঁড়ে যাবে বন্য চীৎকারে আর দেখতে-না-দেখতে সে তার সমস্ত নিয়ে আগুনে অঙ্গার হয়ে উঠবে। তার সমস্ত অর্থ—তার লজ্জা, তার দৈন্য, তার সাহসহীনতা। তার এই আনর্থক্য।

কিন্তু আজকের চাঁদ আতঙ্কের চাঁদ নয়, ঘুম পাড়াবার চাঁদ। একটু ঘুমুলোই না-হয় ভবতোষ। কাল যে আত্মহত্যা করবে চাঁদের বৈমুখ্যে আজকে তার নালিশ না করলেও চলে।

ভবতোষ সত্যি-সত্যি ঘুমিয়ে পড়লো। অন্তত খানিকক্ষণের জন্যে ভুললো যে কাল তাকে আত্মহত্যা করতে হবে। ভুললো, তিন দিন ধরে আধপেটা খাচ্ছে, সাত দিনের উপর সে ঘুমুতে পাচ্ছে না, এক মাসেরো উপর পরনে তার একটা আস্ত কাপড় নেই। ভুললো সংসারে যে চিনির পাট নেই, জুতোর হাঁ-টা যে বোজানো যাচ্ছে না, কয়েক দিন আগে একমাত্র লেখবার টেবিলটা যে পোড়াতে হয়েছিল কয়লার অভাবে। ভুললো তার অসহায় স্ত্রী, অসহায়তর শিশুগুলি। ভুললো সে ইস্কুলমাস্টার।

সংকল্পের উত্তাপের দরুন তাড়াতাড়ি ঘুম ভাঙলো ভবতোষের। দিনের আরম্ভটি কেমন যেন নতুন লাগলো।

নতুন লাগলো, সুধার কাংস্য-কর্কশ কণ্ঠস্বর অনেকক্ষণ শোনা গেল না। তার অগণিত অভিযোগের তালিকা। তবে কি ঘটেছে কিছু অভূতপূর্ব? শোঁকা যাচ্ছে কি উনুনের ধোঁয়া?

ভবতোষ নেমে এলো তক্তপোষ ছেড়ে। নিচে মেজের উপর গড়াচ্ছে এখনো শিশুগুলি, সুধার জায়গাটা শুধু ফাঁক। যেখানে ঘুম মানে বিস্মরণ

সেখানে এত ভোরে ওঠবার মানে কী? আর উঠলোই যদি, নিজেকে সে জানান দিচ্ছে না কেন?

ছাত নেই, ভবতোষ তাই খুঁজলো একতলাতেই। কোথাও সুধার ঠিকানা পাওয়া গেল না। রান্নাঘর থেকে কলতলা—কতটুকুই বা জায়গা-—ঘুরে-ঘুরে বারে-বারে ভবতোষ দেখতে লাগলো, কোথাও সুধা নেই। হঠাৎ তার চোখে পড়লো সদরের খিল খোলা।

একটা ছুরির ফলা ভবতোষের বুকের মধ্যে যেন দাগ কেটে দিল—তবে কি সুধা ঘরে নেই? দরজা খুলে গলির মোড় পর্যন্ত ব্যস্ত হয়ে সে ঘুরে এলো, একটা ঝাড়ুদারনি ছাড়া দ্বিতীয় স্ত্রীলোক দেখা গেল না।

ভবতোষ কি পাগল না অসৎ যে স্ত্রীকে অসতী ভাববে? নিশ্চয়ই আছে কোথাও বাড়ির মধ্যে। সদরে খিল দেয়া নেই, মানে দিতে ভুলে গিয়েছিল।

ফিরলো ভবতোষ। ঢুকলো শোবার ঘরে। ছেলে-মেয়েগুলো তেমনি ঘুমে, কিন্তু ওদের মা কোথায়? চেঁচিয়ে ডাকা যায় না, তবু ডাকলো দুবার সুধা বলে। তক্তপোষের তলাটা শুধু দেখতে বাকি ছিল, তাও দেখলো। বাইরে যদি-বা গেছে, নিশ্চয়ই সেটাকে বাইরে বলে না। ফিরে আসবে এখুনি। রোদ ওঠবার আগেই। কিন্তু তাকে না বলে প্রায় রাত-থাকতে সদর খুলে সে বাইরে যাবে সেটাই বা কোন দিশি? রোজই যায় নাকি এ রকম?

কোনো কিছু হদিস রেখে গেছে কি না ভবতোষ তাই খুঁজতে লাগলো ব্যস্ত হাতে। তক্তপোষে তার তোষকের তলাটাই হচ্ছে সুধার চিঠিপত্র রাখার জায়গা। উলটে-পালটেও কোনো খেই পেল না কিছুর। শুধু সুধার নিজের বালিশের নিচে চাবির গোছাটা পড়ে আছে। বুকটা কেঁপে উঠলো ভবতোষের—চাবি যখন নেয়নি আঁচলে বেঁধে, তখন সে বুঝি আর ফিরে আসবে না।

চাবি দিয়ে ভবতোষ সুধার হাতবাক্সটা খুলে ফেললো। যা ভেবেছিল সে। সুধা আর নেই। সুধা তার হাতের দুগাছি সোনার চুড়ি হাতবাক্সে রেখে গেছে।

ঐ দুগাছি সোনার চুড়িই সুধার শেষ আভরণ। আর বাকি যা-কিছু ছিল কাগজের টুকরোয় পর্যবসিত হয়ে জঠরের আগুনে ভস্মসাৎ হয়ে গেছে। ঐ দুগাছি রেখে দিয়েছিল সে আয়তির চিহ্ন হিসেবে তত নয়, যত একটা কিছু বড় রকমের বিপদ-বিশৃঙ্খলার হাত এড়াতে। যদি বোমা পড়ে কোলকাতায় আর তাদের চলে যেতে হয় শহর ছেড়ে, তবে ঐ দুগাছি সোনার চুড়িই হয়তো তাদের কিছু দূরের পথ দেখাবে। তাই সব সময়ে হাতে রেখেও তাতে হাত দেয়নি সে কোনো দিন। সেই চুড়ি দুগাছ আজ তার হস্তচ্যুত! কী মানে দাঁড়ায় এর?

স্পষ্ট, অবধারিত। সুধাই গেছে আত্মহত্যা করতে। ভবতোষের আগে, ভবতোষকে কলা দেখিয়ে। তার পতিবত্নীত্ব বজায় রেখে।

উদ্ভ্রান্তের মতো ভবতোষ রাস্তায় বেরিয়ে গেল। ছেলেমেয়েরা ঘুমুচ্ছে, ঘুমোক। যতক্ষণ না জানতে পারে। যতক্ষণ না জানতে পারে ক্ষুধার দগ্ধশলাকা।

কোথায় যেতে পারে সুধা? কোথায় আবার! গঙ্গায় নিশ্চয়। এখন জোয়ার এসেছে গঙ্গায়। আর, সুধা সাঁতার জানে না। সন্দেহ কী!

বেশি দূর নয় গঙ্গা। গলি থেকে বেরিয়ে ডান দিক খানিক গিয়ে মোড় ঘুরলেই। প্রায় ছুটতে-ছুটতে ভবতোষ পৌঁছুলো গঙ্গার ঘাটে। এ-ঘাট থেকে ও-ঘাটে। ভিড় জমেছে প্রাতঃস্নাতকদের। কোথাও সুধার উদ্দেশ পাওয়া গেল না। না ঘাটে না জলে।

ভীষণ হৃতবল মনে হতে লাগলো ভবতোষের। নিরাশ, নিরুৎসাহ। সে পারলো না আগে মরতে। সে পারলো না বাঁচিয়ে রাখতে তার আত্মহত্যার ইচ্ছা।

ফের ফিরতে হয় বাড়ি। কে জানে, হয়তো ফিরেই দেখতে পাবে সুধাকে। গঙ্গা থেকে স্নান করে বাড়ি ফিরেছে ভেজাচুলে। উনুন ধরিয়েছে। কিন্তু তারপর, রাঁধবে কী? চাল কই?

তবু, সে ফিরেছে এই লালসাটি লালন করেই ভবতোষ এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করলো। দেরি করলো খানিকক্ষণ। যেন ফিরতে সময় দিল সুধাকে।

হয়তো মন থেকে আত্মহত্যার ইচ্ছাটাকে তুলে ফেললেই সুধাকে ফিরে পাবে সে। হঠাৎ এই জন-প্রবাহকে ভালো লাগলো তার, ভালো লাগলো রোদের প্রথম ঝাঁজ, খানিক পরে ফের মেঘলা হয়ে যাওয়া। সুন্দর বলে মনে হলো সুধাকে। তার শরীরের ঠামটি মনে হলো এক টানে একটি লাবণ্যের রেখাঙ্কন। মৃত্যুর থেকে মুখ ফিরিয়ে আনতেই সাধ হলো সুধাকে স্পর্শ করে।

বাড়িতে যে-চমক সে দেখবে বলে সে আশা করেছিল তা দেখলো সে ছোট দুটোর কান্নায় আর বড়টার রুদ্ধ-শোক গাম্ভীর্যে। বড়টা মেয়ে, সাবিত্রী, বয়স দশ। ছোট দুটো ছেলে। সবশেষটা তিন বছরের। মাঝ-খানে দুটো কাটা পড়েছে।

'কি, মা কোথায়?' ভবতোষ জিগগেস করলো সাবিত্রীকে।

'বা, তোমরা তো এক সঙ্গেই গেলে। তোমার সঙ্গেই তো মার ফেরবার কথা।'

'কী যে বলিস! আমি তো গেছলাম তাকে খুঁজতে। কোথাও দেখতে পেলাম না।'

সাবিত্রী স্তম্ভিত হয়ে রইলো। ছোট দুটো খানিক থেমে আবার উচ্চে তান তুললো। সবাইর ধারণা ছিল বাবা আর মা এক সঙ্গেই ফিরে আসবে। কিন্তু বিপদের এমন চেহারাটা তারা কল্পনাও করতে পারেনি। একটা হতবুদ্ধিকর ঘটনা। কোথায় যাবে কী করবে ছেলেমেয়েগুলোকে

কি প্রবোধ দেবে কিছুরই কিনারা করতে পারে না ভবতোষ। আর এটা এমন একটা হৈ-চৈ করবার মতোও ঘটনা নয়, ঢাক পিটিয়ে রাষ্ট্র করা যায় না। মৃতদেহ না পাওয়া পর্যন্ত কেউ বিশ্বাস করবে না আত্মহত্যা বলে। মুখে যাই বলুক, ঢোল পিটবে মনে-মনে। তার চেয়ে গলায় দড়ি বেঁধে সিলিঙের কড়ায় ঝুলে থাকলেও যেন এমন কেলেঙ্কারি হতো না। একটা প্রমাণের আরাম পেত অন্তত।

কাউকে বলা যায় না, তবে কী ব্যবস্থা করবে ছেলেপিলেগুলোর? কী খেতে দেবে তাদের? ইস্কুলেই বা সে যাবে কখন? তার পর, জোগাড় হয়েছে সন্ধ্যেয় একটা নতুন টিউশনি, তারই বা কী হবে? সর্বত্র রাষ্ট্র না করেই বা কি উপায়!

সূর্য মুহ্যমান হয়ে এলো পশ্চিমে, তবু সুধার দেখা নাই। অঙ্কের মাস্টার কাশীনাথবাবু পাড়ায় থাকেন, তাঁরই বাড়িতে ছেলেমেয়েগুলোর খাওয়া হলো এ বেলা। তবু একটা ওজুহাত জুটেছিল তাদের অদৃষ্টে। ভবতোষ অভুক্ত। হয়তো সেই একই ওজুহাত।

কিন্তু কাল? কাল কি তার শূন্য হাঁড়ির খবর সে চেপে রাখতে পারবে? কিন্তু কালকের মধ্যেই কি সুধার মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যাবে না?

সন্ধ্যের টিউশনিটা যে খোয়া যাবে এই ভবতোষের দুঃখ। ছাত্রের বাপ ভীষণ কড়া, পাঁচ মিনিট দেরি হলেই মাইনে কাটবার ভয় দেখায়, গোটা এক দিন কামাই করলে বরখাস্ত করবে। কোন কিছুই তো জানতে সুধার বাকি ছিল না।

শুধু টিউশনিটাই বা কেন? তার অবোধ ছেলে-মেয়ে, তার অযোগ্য স্বামী, তার ছন্নছাড়া সংসার।

বাড়িতে বাতি জ্বালবে কি না ভবতোষ ভাবছিলো, দেখলো কে আসছে গলি দিয়ে। নিভূর্ল মেয়েছেলে। পরনে খাটো ফেঁসে-যাওয়া নোংরা কাপড়—পাড় আছে কি নেই চোখে পড়ে না—হাত-গলা সব খালি,

এক হাঁটু ধুলো। যেন দাঁড়াতে পাচ্ছে না এমনি তার চলা, হাতে আবার একটা পুঁটলির ভার। ভবতোষ বেরিয়ে এলো রোয়াকের উপর। সুধাই তো সত্যি।

কী যে হতে পারে সুধার, নিশ্বাস নিতে-নিতে কিছুই ভেবে উঠতে পারলো না ভবতোষ। কাছে এলে শুধু জিজ্ঞেস করলে, 'এ কী?'

সুধা বললো, 'চাল।'

'চাল?' যেন ভবতোষ কোনো দিন নাম শোনেনি ও-জিনিসের।

'হ্যাঁ, দু সের চাল পেয়েছি।' সুধা হাসলো। অসীম ক্লান্তির মাঝেও যেন জয়ের একটু স্পর্ধা আছে লেগে।

যেন বহু দূর পথ পার হয়ে ভিক্ষে করে কুড়িয়ে এনেছে এমনি মনে হলো ভবতোষের। বললে, 'পেলে কোথায়?'

'কনট্রোলের দোকান থেকে। রাত থাকতে গেছি আর ফিরছি এই সন্ধ্যেয়। তোমরা না জানি কত উতলা হয়েছ,' সুধা হাসলো অন্তরের স্বচ্ছতায়: 'কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেছিলাম চাল না নিয়ে বাড়ি ফিরবো না কিছুতেই। তাই মাঝখানে দোকান বন্ধ হয়ে গেলেও লাইন ছাড়িনি। কত ধাক্কাধাক্কি, কত ধস্তাধস্তি, তবু টলিনি এক পা, মাথার উপর তুমুল এক পশলা বৃষ্টি পর্যন্ত হয়ে গেল। ষোলো ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে পেলাম তবে এই দু সের। উঃ, আমি তো কত লোকের ঈর্ষার বস্তু, কত লোকেই তো কিছু পায়নি, যারা দাঁড়িয়েছিল আমার পিছনে। পুরুষের লাইনেও তাই। আমিও নিলুম, আর বললে, ফুরিয়ে গেছে।'

'কিন্তু এমন একটা বিশ্রী পোষাকে গিয়েছিলে কেন? হাত-পা খালি, পরনে আমার তেল-মাখবার ধুতিটা। গায়ে জামাও নেই বুঝি কোনো?'

'বস্তির ঝি না সাজলে কি দাঁড়ান্ যায় কনট্রোলের লাইনে?' দিগ্‌বিজয়িনীর মতো চালের পুঁটলি নিয়ে সুধা বাড়ির মধ্যে চলে গেল।

মাকে ফিরে পেয়ে ছেলেমেয়েগুলির উত্তালতা তখনো থামেনি, গলির মুখে ভবতোষ দেখতে পেল একটি পুরুষমূর্তি। দ্বিধায় দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে, গলিতে ঢুকবে কি ঢুকবে না। শেষ পর্যন্ত ঢুকলো, আর এগিয়ে এলো কি না ভবতোষেরই বাড়ির দিকে।

আধাবয়সী, কিন্তু যেন ঠিক ভদ্রলোকের পর্যায়ে পড়ে না। যদিও গায়ে একটা ছেঁড়া ও কুঁচকোনো চীনে-সিল্কের পাঞ্জাবি। দাড়ি কামায়নি কত দিন। চুলগুলিতে চিরুনির আঁচড় নেই। চাউনিটা কেমন যেন ঘোলাটে, অপরিচ্ছন্ন।

এদিক-ওদিক চেয়ে অত্যন্ত ভয়ে-ভয়ে লোকটা জিগগেস করলো: 'এ বাড়িতে একটি মেয়েছেলে ঢুকেছে এখুনি ?'

মুহূর্তে ভবতোষ রুক্ষ হয়ে গেল। বললে, 'হ্যাঁ, কেন ?'

কি-ভাবে যে বলবে কিছু ঠিক করতে না পেরে আগন্তুক বললে, 'তাকে আমার দরকার।'

'দরকার ?' রাগে কঠিন হয়ে উঠলো ভবতোষের গলা: 'তাকে আপনি চেনেন ?'

'হ্যাঁ, না, ঠিক চিনি না, তবে—' লোকটা আমতা-আমতা করতে লাগলো। ভবতোষ ফণা-তোলা সাপের মতো বিষিয়ে উঠলো: 'আরো দুটো গলি ছেড়ে দিয়ে শুঁড়িখানার কাছে থামের তলায় আপনার চেনা জিনিস পাবেন। যান সেখানে। এটা বস্তি নয়, গেরস্থ-বাড়ি। যাকে ঝি ভেবে পিছু নিয়েছেন, সে ঝি নয়, ভদ্রলোকের স্ত্রী।'

লোকটা যেন তবু এক কথায় চলে যেতে প্রস্তুত নয়। দোমনা করছে—ঘুর-ঘুর করছে।

'কেলেঙ্কারি বাধাবেন না বলছি। ভালোয়-ভালোয় বেরিয়ে যান গলি থেকে, নইলে পাড়ার লোক জড়ো হলে ঘাড়ের উপর মাথাটা আপনার সোজা থাকবে না বলে রাখছি। আমি অভুক্ত আছি বটে, কিন্তু পাড়ার

আর সবাই আমার মতো এত নিস্তেজ হবে না বলেই বিশ্বাস। মারবে তো বটেই, পুলিশেও ধরিয়ে দেবে।'

'আমারই ভুল। মাপ করবেন।' লোকটা আবার সস্পৃহ চোখে তাকালো চার পাশে। তার পর চলে গেল।

কারু সঙ্গে একটা কিছু উত্তেজিত বচসা হচ্ছে এমনি আভাস পেয়ে সুধা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো রোয়াকে। বললে, 'সেই লোকটা এসেছিল বুঝি ?'

'কে লোকটা ?' আপাদমস্তক জ্বলে গেল ভবতোষের।

'সেই চীনে-সিল্কের পাঞ্জাবি-পরা ভদ্রলোক ?'

'ভদ্রলোক ? এরি মধ্যে গাঢ় পরিচয় হয়ে গেছে দেখছি।'

'কী যে বলো তার ঠিক নেই। তাকে তাড়িয়ে দিয়েছ বুঝি ?' সুধা যেন কণ্ঠস্বরে তাকে খুঁজছে।

'না, তাকে আমার খাট ছেড়ে দিতে হবে।' ভবতোষ গলার আওয়াজকে কুৎসিত করে তুললো: 'ওটা একটা বদমাস, তোমাকে ভেবেছে বস্তির ঝি।'

'তা যা খুসি ভাবুক, কিন্তু আমিই তো ডেকে এনেছিলাম।'

কাছাকাছি বোমা পড়লেও ভবতোষ এত চমকাতো না। বললে, 'তুমি ডেকে এনেছ ? কেন জানতে পারি ?'

'চারটি ওকে খেতে দেব বলে। ও আমার সামনেই ছিল, পুরুষের লাইনে। আমার নেয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দোকান বন্ধ হয়ে গেল, আর ও আমার চোখের উপর মাটিতে ভেঙে পড়লো টুকরো-টুকরো হয়ে। বললে, বাড়িতে বসে আছে সবাই চালের প্রত্যাশা করে, সে গেলে তবে উনুন ধরবে। তবু তো স্ত্রী-পরিবারকে একবেলা আধপেটা সে খাওয়াচ্ছিল, কিন্তু নিজে সে উপোস করে আছে প্রায় চার দিন। পাছে ওদের ভাগে কম পড়ে তাই মিথ্যে করে বলতো যে বন্ধুর ওখানে তার নেমন্তন্ন। কিন্তু

চার দিনের উপোসের পর নেমন্তন্নের কথা নাকি আজ সে কিছুতেই বলতে পারবে না। তাই আমি ওকে বলেছিলাম, চলুন আমার ওখানে, অন্তত ভাত খাবেন আপনি পেট ভরে। প্রথমটা বিশ্বাস করেনি। পরে বিশ্বাস করলেও রাজি হতে পারেনি। স্ত্রী-পুত্রের জন্যে চাল না নিয়ে গিয়ে নিজে ভাত খাবে লুকিয়ে, হয়তো যন্ত্রণা হচ্ছিল, কিন্তু জঠরের যন্ত্রণা তার চেয়েও ভয়ানক। আহাহা, তড়িয়ে দিলে তুমি?' সুধা গলা বাড়িয়ে তাকালো এদিক-ওদিক।

আস্তে আস্তে একটা তীব্র, ঘন, উগ্র গন্ধ ভবতোষকে আচ্ছন্ন করতে লাগলো। যেন তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে এখুনি। চোখ ঠিকরে বেরিয়ে পড়বে।

না, ও কিছু নয়। ও শুধু উনুনের ধোঁয়া।





দোলনা

প্রথমটা অতুল স্তম্ভিত হয়ে রইলো, পরে উঠলো চেঁচিয়ে।

আর, তার উত্তরে কিনা ঐ নির্বারিত, নির্ঝরিত হাসি!

'কী সর্বনাশ! খোলা ছাদ, পড়ে যাবে যে।' মুহূর্তে চোখে অন্ধকার দেখলো অতুল, হাত-পায়ের প্রান্তগুলো তার ঠাণ্ডা হয়ে এলো, আর শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরা গেল ছিঁড়ে, তালগোল পাকিয়ে। মনে হলো এই বুঝি সে পড়ে যাবে মেঝের উপর।

ঘুরতে-ঘুরতে ছুটতে-ছুটতে হাসতে-হাসতে মেয়েগুলো বললে, 'আমরা পড়ি না।'

এমন অবস্থায় সুমুখের জানলাটা বন্ধ করে দেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এ রোমাঞ্চ অতুলের দুর্বল স্নায়ুর পক্ষে অসহনীয়।

এই সেদিন সামনের ঐ আমগাছটার ডগায় গিয়ে উঠেছিলো চাঁইদের ছোট ছেলে, মরা ডাল ভাঙবার জন্যে। কী সাঙ্ঘাতিক সাহস ছেলেটার! কখনো উপুড় হয়ে শুয়ে হাত বাড়িয়ে, কখনো-বা এক পায়ে দাঁড়িয়ে অন্য পা বাড়িয়ে ছেলেটা সরু-সরু শুকনো ডাল পট-পট করে ভেঙে ফেলে দিচ্ছে নিচে, আর যখুনি এই পড়ে গেল বলে অতুল বুক চেপে ধরছে, তখুনি ছেলেটা শীর্ণতর আরেকটা শাখায় গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। ছেলেটার কী হচ্ছিলো কে জানে, অতুলের বুকের মধ্যে হাপর চলছিলো কামারের। সামান্য দু পয়সার জ্বালতির জন্যে এই জীবন-সংশয়। অনেক চেঁচামেচিতেও যখন ছেলেটাকে নামালো গেল না, অতুল তখন নিরুপায় হয়ে সামনের জানলাটা বন্ধ করে দিল।

এখানে এখন জানলাটা তেমনি বন্ধ করে দেয়া উচিত, যদি হৃৎপতন থেকে অতুল বাঁচতে চায়। কিন্তু চোখ ফেরাবো বললেই আর চোখ ফেরানো যায় না।

বড়ো মেয়েটাই সব চেয়ে দেখতে ভালো—তাতে সন্দেহ কী। আর কিছুতে না হোক, বয়সে অন্তত। অন্তত পোষাকে। পোষাকের প্রাখর্যে।

'গেল, গেল—পড়লো সবগুলি।' অতুলের গলা চিরে তিন-তিনটে আওয়াজ বেরুলো।

কিন্তু মেয়েগুলোর মুখে হাসি ছাড়া কোনো শব্দ নেই। যেমন ঘুরছে তেমনি হাসছে। গোলমাল শুনে নিচে থেকে স্বয়ং প্রোপ্রাইটর এসে হাজির হলো। কৃষ্ণকান্তি, বৃহদ্বপু।

'এরা কি শেষকালে একটা কেলেঙ্কারি বাধাবে নাকি?' অতুল ঝলসে উঠলো: 'ন্যাড়া ছাদ, কালকের রাতের বৃষ্টিটা ভালো করে এখনো শুকোয়নি, আর এরা আলসের উপর দিয়ে ছুটোছুটি করছে। যদি ছিটকে একটা পড়ে যায় রাস্তায়!'

'পড়বে না বাবুজি, পড়বে না।' ভীমকান্তি প্রোপ্রাইটর অতুলের কাঁধের নিচে মৃদু-মৃদু চাপড় দিতে লাগলো।

'দৈবের কথা কে বলতে পারে? নিচে তো আর নেট টাঙিয়ে রাখেননি!' অতুল ঝাঁজিয়ে উঠলো: 'একটার কারু অপঘাত মৃত্যু হোক আর আমার বাড়ির বদনাম রটে যাক। ভাড়াটে একটাও না পাই ইহজীবনে।'

'এই, থাম তোরা।' ধমকের মতো করে বলে প্রোপ্রাইটর।

মেয়ে চারটে থেমে পড়লো। বড়োটার চুল ছাঁটা, আর ছোট তিনটে দু-দুটো করে বেণী দুলিয়ে হাসতে-হাসতে চলে গেল নিচে।

'খোলা ছাদে ওদের একটু একসারসাইজ করতে পাঠিয়েছিলাম—' বিনীত ভঙ্গিতে বললে প্রোপ্রাইটর।

'তা করুক না যত খুসি। তাই বলে আলসের উপর দিয়ে ছুটতে হবে নাকি?' অতুলের চোখ থেকে আতঙ্কের আভাস তখনো কেটে যায়নি: 'ওদের কী, ওরা না হয় মাটিতে পড়ে গিয়েও হাসবে, কিন্তু এদিকে আমার প্রাণ যে খাঁচা-ছাড়া।'

প্রোপ্রাইটর হাসলো। বললে, 'কিছু ভয় নেই। ব্যালেন্স ওদের বেশ ভালোই শেখা আছে। রাতের শো-তে যাবেন না আজ। দেখবেন তখন

সুভদ্রাকে।' প্রোপ্রাইটর আবার অতুলের কাঁধ চাপড়ালো : 'আপনার কিডনির কাজ নিশ্চয়ই ভালো হচ্ছে না। নইলে এই সামান্যতেই আপনার ভয়!'

ভাদ্র মাসের শেষ। থেকে-থেকে বৃষ্টি হচ্ছে এখনো। দুতিনটে বিল জড়িয়ে নদীর বিস্তৃতি বহুদূর ছড়িয়ে পড়েছে। খেয়া-পারাপারের পাঁচ মিনিটের জায়গায় লাগে প্রায় এখন পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

এমন সময়ে এখানে সার্কাস-পার্টি আসছে শুনে অতুল গোড়ায় খানিকটা আশ্চর্য হয়েছিলো সন্দেহ নেই। কিন্তু এবার চাষীরা ভাদোই খুব ভালো পেয়েছে, তাই তাক বুঝে ওদের থেকে লুটে নেবার মতলোবেই যে এরা এসে পড়েছে তাড়াতাড়ি তা বুঝতেও অতুলের দেরি হয়নি। প্রথমটা সে ঠিক করেছিলো সমস্ত সে ভণ্ডুল করে দেবে, চাষীদের বাঁচাবে সে এই অকারণ অপচয় থেকে। তাই, আগে, সার্কাস-পার্টির লোক যখন তার বাড়ির একতালাটা ভাড়া চাইতে এসেছিলো, সে রাজি হয়নি। কিন্তু কালকের বৃষ্টিটা কেন-কে-জানে তার প্রতিজ্ঞাটা হঠাৎ মুছে দিয়ে গেল। বিকেল থেকেই বৃষ্টি নেমেছিলো, ট্রেন আসবার আগেই। সন্ধেসন্ধিতে সার্কাসের প্রোপ্রাইটর এসে অতুলের সঙ্গে দেখা করলে, বললে, বাজারের মধ্যে তার নিজের জন্যে যে বাড়িটা ঠিক করা হয়েছে তার সবই আছে কেবল ছাদ নেই, বৃষ্টিতে সপরিবারে তাই সে রাস্তায় এসেছে চলে, এখন অতুল যদি না দয়া করে তবে তারা আর ফিরে যাবারো রাস্তা পাবে না।

'যত ভাড়া আপনি চান—যা কিছু সুবিধে—' বৃহদ্বপু প্রোপ্রাইটর দীন-দুর্বলের মতো বললে।

স্বদেশী-করা অতুল টলতো না যদি না একটা বিদ্যুৎ উঠতো ঝলসে। চকিতে, ঝাপসা ভাবে, দেখলো ছোট-বড়ো একদল মেয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিজছে আর মেঘ-গর্জনের মধ্যেও শুনতে পেলো তাদের টুকরো-টুকরো হাসির শব্দ।

অতুল ভেবে দেখলো চাষীদের নিরানন্দ জীবনে শ্রান্তিবিনোদনের পক্ষে সার্কাসটা মন্দ কী। সম্বৎসর কাটিয়েছে তারা শীর্ণতার মধ্যে, এখন যদি শস্যোচ্ছ্বাসের ফলে উদ্বৃত্তি কিছু ঘ'টে থাকে তাদের, তা দিয়ে ক'টা সন্ধ্যা তারা সম্ভোগ করুন না! কার্নিভ্যাল বা জুয়োখেলা হলে তার আপত্তি হতে পারতো, কিন্তু সার্কাসের মতো নির্দোষ প্রমোদ আর কী আছে! নিচের তলাটা অতুল ছেড়ে দিল প্রোপ্রাইটরকে।

একা মানুষ, বিয়ে করেনি, দোতলার দুখানা ঘরই অতুলের যথেষ্ট। খাতালেখার যে দুজন মুহুরি নিচে এক পাশে থাকতো তাদেরকে সে পাঠিয়ে দিল গদিতে। প্রোপ্রাইটর নিঃসঙ্কোচে প্রসারিত করলো নিজেকে।

সামান্য তেজারতি থেকে চালের বিরাট কারবার গ'ড়ে তুলেছে অতুলের বাবা, কালীবর সিং। তাকে যে কোনো অবস্থায় খুন করলেই যে তার গায়ের মাংসের ভাঁজ থেকে কম-সে-কম হাজার দশেক টাকা বেরিয়ে আসবে এ সম্বন্ধে জনশ্রুতি অত্যন্ত প্রবল। প্রৌঢ়তার সীমায় এসে কালীবরের হঠাৎ মদের প্রতি লিপ্সা জাগে এবং দেখতে-না-দেখতে কারবারটি সে গোল্লায় দিতে বসে। অতুল তখন আইন পাশ করে ওকালতি করবে না আর কোনো ব্যবসা ফাঁদবে তারই কল্পনায় ব্যস্ত, এমন সময় বাবার আকস্মিক অধোগতির খবর তার কানে আসে। সটান গ্রামে ফিরে গিয়ে ব্যবসা সে নিজের হাতে তুলে নেয়, বাপকে তাড়িয়ে দেয় দেশের বাড়িতে, আর তার মদের খরচের জন্যে বরাদ্দ করে দৈনিক পাঁচসিকে। তারপর থেকে চালের ব্যবসা সে চালিয়ে যাচ্ছে ঠিক, কিন্তু যাই বলো, কোনোই রোমাঞ্চ সে খুঁজে পাচ্ছে না। শুধু নামে কি আর চিঁড়ে ভেজে? বাঁকতুলসী, সমুদ্রবালি বা বাসমতি? মন ওঠে কি শুধু পয়সায়? এক জায়গায় বসে থাকায়? অনেকে অনেক কিছুই বলেছে, কিন্তু কোনোটাই অতুলের পছন্দ হয়নি। আজকে হঠাৎ তার ভাবের বাষ্প

ফুলতে-ফুলতে প্রকাণ্ড একটা তাঁবুর আকার ধারণ করলো। ভাবলো, সার্কাস!

এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যাওয়া, তাঁবু খাটিয়ে-খাটিয়ে। স্পেশ্যাল ট্রেনে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড খোলা ট্রাকে মাল বয়ে নিয়ে যাওয়া, শাল কাঠের খুঁটি, গ্যালারির তক্তা, খাঁচায়-পোরা বাঘ, শেকলে-বাঁধা হাতি। সমস্ত সময়চিহ্নিত ট্রেনের পাশ কাটিয়ে এ-লাইন থেকে ও-লাইনে এঁকে-বেঁকে হঠাৎ বে-টাইমে এক অজানা জায়গায় চলে আসা, ভাবতেও কেমন নতুন-নতুন লাগে। ধরা-বাঁধা নেই, সিজিল-মিজিল নেই, সমস্ত কিছুতেই একটা অনিশ্চয়তার ছাপ মারা। কোথায় থাকতে পাওয়া, আড়তে না আড়গড়ায়, কিছুই ঠিক-ঠিকানা নেই। তা ছাড়া নিজেদের চা-রুটি জোটালেই চলবে না, বাঘের জন্যে চাই পাঁঠা, ঘোড়ার জন্যে চানা, হাতির জন্যে কলাগাছ। তারপর, কে জানে, কী ভাবে লোকে নেবে; ব্যাণ্ড-বাজানো ও প্রোগ্রাম-বিলোনো গাড়ির পিছনে ছুটবে কেমন ছেলের দল, গ্যালারি ছাপিয়ে লোক নেমে আসবে কিনা ঘাসের সতরঞ্চিতে। মোট কথা, তাঁবুটা ফাঁপবে না ফাঁসবে। সমস্তই একটা অদ্ভুত অন্ধকার—

দোতলার সিঁড়ির কাঠের রেলিং বেয়ে ঘূর্ণ্যমান একটা ঘাঘরা নিচে নেমে গেল হঠাৎ। তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে কেউ বোধ হয় পড়ে গেল পা পিছলে—এমনি মনে হলো অতুলের। হয়তো কেউ কাউকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে নিচে, এখুনি হয়তো শুনতে পাবে একটা পিণ্ডাকার শব্দ আর কাতর অর্তনাদ। কিন্তু তখুনি আবার কার ঘুরন্ত ঘাঘরা সিঁড়ির উপর দিয়ে নেমে গেল ক্ষিপ্রছন্দে। এটাও পড়লো বুঝি মুখ থুবড়ে। বসবার চেয়ারটা উলটিয়ে দিয়ে অতুল রুদ্ধশ্বাসে নেমে এলো। দেখলো, আগেরটা রত্না, পরেরটা লক্ষ্মী, এবার রুক্মিণী—একের পর এক রেলিঙের উপর দিয়ে ছুটে নামছে, আর নিচে থেকে হাত বাড়িয়ে লুফে নিচ্ছে তাদের সুভদ্রা।

যেন নেহাৎ বড়ো হয়েছে বলেই এমনিধারা ছেলেমানসি খেলায় সে শোভা পাবে না এমনি একটি গরিমা তার চেহারায়।

'এরা যে নিউটনের আইনকেই অমান্য করছে—' অতুল আবার একটা আতঙ্কিত প্রতিবাদ করলো।

প্রত্যুত্তরে আবার সেই চূর্ণ-চূর্ণ হাসি। চোখে ঝিলিক দিয়ে সুভদ্রা বললে, 'এ সব কী! দেখবেন সন্ধের সময়।'

অনেক দিন এ সব অঞ্চলে ঘুরে-ঘুরে শিখে নিয়েছে এরা ভাঙা-ভাঙা বাঙলা। বাধে না কোথাও।

উচ্চারণের মিষ্টি ত্রুটিটুকুর জন্যেই এদেরকে অতুল কথা কওয়াতে চায়। কিন্তু এরা বলে কম, হাসে বেশি।

'এখুনিই যা দেখছি তাইতেই তো সন্ধে ঘনিয়ে এসেছে বলে মনে হচ্ছে।' বললো অতুল, বুকের বাঁ পাশে হাত রেখে।

রত্নাকে ফের লুফে নেবার জন্যে সুভদ্রা হাত বাড়িয়ে দিল। বললে অন্যমনস্কের মতো, 'এ সব তো আমাদের একসারসাইজ, শরীরের আড় ভেঙে নেয়া—'

মেয়েটা পড়ে যাচ্ছিল বুঝি। কিন্তু না, কী সবল, বিশ্বাসী বাহু! কাঁধের কাছটা কত পেশল, পরিপুষ্ট! ওদিকে না তাকিয়েও কী অনায়াসে ও কত অভ্যাসবশেই যেন টেনে নিয়েছে রত্নাকে!

অতুল বললে, 'তুমি একবার দৌড়ুবে না এমনি?'

'বলুন' আপনি ধরবেন এমনি নিচে থেকে?'

'সর্বনাশ! আমার ঘাড়ের উপর আশ্রয় নাও আর-কি!' মেয়েদের আরেক চোট হাসতে দিয়ে পালিয়ে গেল অতুল।

নিয়েছে এখানকার লোকেরা, প্রথম সন্ধেতেই।

ইস্টিশনের কাছে আম-বাগানের পিছনে তাঁবু পড়েছে সার্কাসের; জলছে

দুর্ধর্ষ ডে-লাইট, বাজছে দুর্দম্য ব্যাণ্ড, আর জড়ো হচ্ছে এসে দুর্বার জনতা। একটি একটি লণ্ঠন সম্বল করে এক-একটা পাড়া উঠে আসছে আস্ত। কাছে-পিঠে নয়, দূরের-দূরের গ্রাম। নদী-নালা পেরিয়ে মাঠ-ঘাট ডিঙিয়ে, জান-জাঙাল ভেঙে। ট্রেনে, গরুর গাড়িতে। কাচ্চা-বাচ্ছা, জোয়ান-বুড়ো, কেউ বাদ নেই, রাতারাতি বসে গেছে সব দোকান-দানি, পান-সিগারেটের, তেলেভাজার, চা-বিস্কুটের। মেলা মনে করে আম-গাছের ঝোপের ঝাপসাতে দাঁড়িয়েছে এসে দুয়েকটি বা গ্রাম্য গণিকা। অতুলের জন্যে তার নিজের বসবার চেয়ার নিয়ে আসা হয়েছে বাড়ি থেকে, তার আলাদা মর্যাদা। গণ্য-মান্য আর যাঁরা এসেছেন 'পাসে', বসেছেন তাঁরা সব সার্কাসের গোদা-গোদা কাঠের চেয়ারে, পিঠ খাড়া করে। প্রথম খেলাতেই সুভদ্রা যে সার্কাসী কায়দায় হাওয়াতে হাত হেলিয়ে অভিবাদন সেরে রাঙা সূক্ষ্ম হাসিটুকু হাসলো তা শুধু অতুলের জন্যে!

দৈন্য-দশা সার্কাসের, যদিও নামটা তার রাজকীয়। তাঁবুটা জায়গায়-জায়গায় ছেড়া, তাকালে তারা দেখা যায়। গ্যালারিতে বসবার জন্যে যে তক্তা তা যেন মূল আকারকে চিরে অর্ধেক করা। মেয়েদের আব্রুর আকর্ষণ বাড়াবার জন্যে যে জালের পর্দা টাঙানো হয়েছে তা নিজেই নির্লজ্জ। খেলুড়েদের পোশাকগুলো ময়লা, কোথাও বা সেলাই-করা। ক্লাউন দুটো অমানুষিকভাবে কদাকার। আর, চাকর-বাকরগুলি সত্যি-সত্যিই চাকর-বাকরের মতো। কিন্তু যাই হোক লোক হয়েছে বটে।

প্রথমেই ঝুলন্ত দোলনার খেলা, একটাতে সুভদ্রা, আরেকটাতে নাগস্বামী। দোলনার নিচে চার কোণের চার থামের সঙ্গে বেঁধে দড়ির জাল টাঙানো। এমন অবস্থা, জালটা পর্যন্ত আস্ত নেই। উত্তরের প্রান্তে অনেকটা ফাঁক। মাঝখানটা আঁট আছে বলেই চলছে এখনো।

ডে-লাইটগুলো টেনে তোলা হলো উপরে, বেজে উঠলো ব্যাণ্ড, বাঁশি আর টেঁটরা। হাত-ধরাধরি করে আসরে নামলো এসে সুভদ্রা আর নাগস্বামী।

সুভদ্রার রঙটা মাজা-মাজা, এখন যদিও সেটা পাউডারে-পেণ্টে অত্যন্ত তেজালো, কিন্তু নাগস্বামী নিরবচ্ছিন্ন কালো। শোভন গঠন, দীর্ঘাঙ্গ চেহারা, বয়েস ত্রিশের কাছে। সুভদ্রার শরীর দেখে বয়েস সম্বন্ধে যে উর্ধ্ব ধারণা হতে পারতো তা ঘা খায় এসে তার মুখের চারুতায়, কটাক্ষের কণ্টকে। যোগবিয়োগ করে কুড়ি-বাইশের বেশি মনে হয় না। নাগস্বামীর পরনে গেঞ্জির শাদা আঁট জামা, গায়ের সঙ্গে লেপটানো ; কিন্তু সুভদ্রা এলো ঝোলা একটা আলখাল্লা গায়ে দিয়ে। বিস্ময়কর একটা উদ্‌ঘাটনের বিস্ময়কর নম্বর পাবার জন্যেই সে ঐ অবান্তর ঢিলে জামাটা গায়ে চাপিয়ে এসেছে। এমন নিরবশেষ ভাবে জামাটা সে গা থেকে খুলে ফেলে দিল যে, প্রথমটা অতুলের ভয় করে উঠলো। একটা অতলান্ত গুহার মধ্যে আকস্মিক পড়তে গিয়ে যেখানে সে ধাক্কা সামলে দাঁড়িয়ে পড়লো, সে জায়গাটাও কম বিপজ্জনক নয়। সুভদ্রার গায়েও সেই লেপটানো আঁটা জামা; গোড়ালি পর্যন্ত টানা, পায়ে রবারের রঙিন জুতো, নিরাভরণ হাত কাঁধ পর্যন্ত অনাবৃত, নিরবকাশভাবে মসৃণ। লাবণ্যলীলা-জলে শ্রোণী যে তীর্থশিলা এত দিনে মনে হলো তাকে দেখে। পোশাক যে এত দুঃসাহসী হতে পারে, কে জানতো তা। সর্বাঙ্গে লালিত্য শুধু লিখিতই হয়নি, মোটা পেন্সিলে আণ্ডারলাইন করা হয়েছে। যে লালিত্য স্বাস্থ্যে স্ফূর্তিমান, কাঠিন্যের মেশাল পেয়ে যা সমীচীন। দেহের যদি সঙ্কোচ না থাকে, সুভদ্রা মনেও নিঃসঙ্কোচ।

হাওয়াতে হাত হেলিয়ে হাসলো একটু সুভদ্রা। ঠোঁটে রঙ মাখাটা সইতে পারতো না অতুল। কিন্তু পাৎলা ঠোঁটে রাঙা টুকটুকে হাসি হাসলে কাউকে যে এমন সুন্দর দেখাতে পারে, এও বা তার জানা ছিল কই?

দড়ির সিঁড়ি বেয়ে দুইদিক থেকে দুজনে তারা তরতর করে উঠে গেল উপরে, নাগস্বামী আর সুভদ্রা, ধরলো দুদিকের দুটো ঝুলন্ত দোলনা। তারপর লাগলো দুলতে ; বসে, দাঁড়িয়ে, পায়ের খাঁজের সঙ্গে দোলনার

দণ্ডটা আটকে রেখে মাথা নিচের দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে। আরো নানা রকম দুঃসহ দুরবস্থায়, বিপজ্জনক ভঙ্গিতে। অত্যন্ত দ্রুত, উদ্ধাবিত। গতি বা দ্রুতি শরীরে যে নবতন রেখার সঞ্চার করেছে, তাকে সম্পূর্ণ অনুসরণ করবার আগে আরেকটা ভঙ্গি এসে গ্রাস করছে তাকে। ফুটে উঠছে বা আরো কতগুলি নতুন উদ্ধতি, নতুন উত্তেজনা। এখন, মাথা নিচু করে ঝুলতে ঝুলতে এ-দোলনা থেকে ও-দোলনায় লাফিয়ে প'ড়ে পরস্পর জায়গা বদল করছে। নাগস্বামী কখনো বা অন্য দোলনায় গিয়ে আশ্রয় না নিয়ে হঠাৎ থেমে প'ড়ে উড্ডীনোন্মুখ সুভদ্রাকে শূন্য থেকে কুড়িয়ে নিচ্ছে দুহাতে, আবার তক্ষুনি ছুঁড়ে দিচ্ছে তার পরিত্যক্ত দোলনায়। আবার, কখনো বা সুভদ্রা হাত বাড়িয়ে তুলে নিচ্ছে নাগস্বামীকে, ছেড়ে দিচ্ছে আবার তার নিজের সীমানার কিনারে। সমস্তটাই চলেছে একটা উদ্‌ভ্রান্ত উদ্বেগের মধ্যে। একটানা বাজছে শুধু ত্বরার তারস্বর।

এট'ই আসল খেলা, মাথা নিচু করে দুলতে-দুলতে হঠাৎ এমনি ঝাঁপিয়ে পড়া অন্য হাতে, আবার অন্য হাত থেকে ছাড়া পেয়ে নিজের দাঁড়ে চলে আসা। নাগস্বামী কী অবলীলায়, যেন প্রায় গভীর ঘুমের মধ্যেই, টেনে নিচ্ছে সুভদ্রাকে আর এমন নিষ্ঠুর ভঙ্গি করে তাকে ছুঁড়ে দিচ্ছে যে, অতি কোমলভাবেই সুভদ্রা উঠে আসতে পারছে তার নিজের জায়গাটিতে। একবার যেন সে ইচ্ছে করেই সুভদ্রাকে ধরলো না হাত বাড়িয়ে, নিচে ফেলে দিল জোর করে। পড়ার প্রাবল্যে সুভদ্রা দড়ির জালের উপর দাঁড়িয়ে নাচতে লাগলো। সবাই ভাবলো, একটা বোধ হয় ছন্দপাত হয়েছে, কিন্তু পাকাপাকি সিদ্ধান্ত করবার আগেই সুভদ্রা লাফ মারলো শূন্যে, আর নাগস্বামী তাকে আলগোছে লুফে নিল দুহাতে এবং দুলতে-দুলতে দুজনে এমনভাবে হঠাৎ সংস্রবচ্যুত হয়ে গেল যে, নাগস্বামী ধরলো শূন্য দোলনাটা আর সুভদ্রা

ধরলো নাগস্বামীরটা। উল্লাসে, হাততালিতে তাঁবু আরো ফুলে-ফেঁপে উঠলো।

আরো অনেক খেলাতেই সুভদ্রা ; একক দোলনার পায়ের আঙটার সঙ্গে দোলনার দাঁড়টা আটকে রেখে উন্মত্তগতিতে ঘোরা ; সেখানে সমস্ত রেখা, সরল বা বক্র, বৃত্তের এবং কিছু পরে বিন্দুর আকার নিয়েছে। জাপানী ছাতা মেলে তারের উপর দিয়ে হাঁটাও সুভদ্রা। অন্য দিকে রত্না হচ্ছে আরেক ছত্রধারিণী। পরস্পরের দিকে মুখ করে এগিয়ে আসতে-আসতে আবার পিছু নিচ্ছে, এরি মধ্যে একবার হঠাৎ একে অন্যের পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে উল্টো কোটে। সুভদ্রার সঙ্গে-সঙ্গে রত্নাও নাচছে, সমান গতিতে, কিন্তু বিপরীত ভঙ্গিমায়, যখন তারা একজন আরেকজনের পিছনে। রত্না যখন বাঁ পা তুললে সুভদ্রা তুললে ডান পা। কিন্তু যখন তারা মুখোমুখি, তখন তাদের পা এক হ'লেও পাক-খাওয়াটায় থেকে যাচ্ছে সেই বৈপরীত্য। তারপর, হাতলহীন সাইকেলের খেলাতেও সুভদ্রাই অগ্রণী। একদল ছেলেমেয়ে, দৈর্ঘ্যের অনুপাত অনুসারে সাইকেলের আকার, সব চেয়ে বড়োটা সুভদ্রার, ছোটটা রাঘবের—পাঁচ বছরের। ছোট-বড়ো বৃত্তে ঘুরে-ঘুরে যাওয়া, তারপর দীর্ঘ একটা রেখা হয়ে হাত ধরাধরি করে চলে যাওয়া তাঁবুর বাইরে। সবচেয়ে দুর্দশার কথা হচ্ছে এই, বারে-বারে সুভদ্রা পোশাক বদলে আসতে পারছে না। হয়তো বদলাচ্ছে চুলের রিবনটা বা কোমরে জড়ানো মখমলের পটিটা। কিন্তু কীই বা হতো পোশাক বদলে ? ঢাকতে পারতো না তার এই যৌবনের বন্যতা। এমনি অটুট হয়েই থাকতো তার রেখার কৌটিল্য।

সাজঘরেই ঢুকতে চেয়েছিলো অতুল, কিন্তু প্রোপ্রাইটর হেসে বললে, সার্কাসের গ্রীনরুমটা একটা নির্বাক রুদ্ধশ্বাস জায়গা, সেখানে গালগল্প দূরে থাক, সাধারণ কথা-বার্তা পর্যন্ত বারণ, থিয়েটারের গ্রীনরুমের সঙ্গে এই তার তফাৎ। ও-জায়গায় বচন, এ-জায়গায় ব্যায়াম। সব কথা

বাড়িতে গিয়ে হবে। কিন্তু বাড়িতে এসে প্রোপ্রাইটর বললে, সেকেণ্ড শোর পরে মেয়েরা অত্যন্ত শ্রান্ত হয়েছে, এখন আর ওদের রাত জাগতে দেওয়া ঠিক হবে না। রোজ-রোজ দুবার করে শো, পর্যাপ্ত ঘুম না পেলে ওদের চলবে কেন ?

দেখা গেল পর দিন ভোর বেলা, বাড়ির কাছেই নদীর ধারটিতে। কিন্তু সুভদ্রার পরনে তখন শাড়ি, কাছা-দেওয়া, টান করে আটতে গিয়ে বাঁ হাঁটুর কাছাকাছি পর্যন্ত যা-একটু সামান্য অসাবধান। নচেৎ শাড়িতে তার অনেক বিস্ফার, অনেক বাহুল্য, রাতের সুভদ্রার লেশমাত্র অবশেষ নেই। সমস্ত ক'টি রেখা এমন স্তিমিত, মুহ্যমান; সমস্ত উদ্ধতি এখন ক্লান্তচেতন, বিবাদবিনীত। ভালো লাগে না এই বিষম ছন্দপাত; কেমন অদ্ভুত লাগে। আঁট, লেপটানো ইজেরের বদলে এই স্থূল, হ্রস্ব কাছা, বহুলবিশৃঙ্খল আঁচল। ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা চুল, কিন্তু মুখে একটুও প্রসাধন নেই; নেই আর সেই ঠোঁটের লালিমার অস্তাভা। ভীষণ বেমানান, প্রায় একটা হোঁচট খাওয়ার মতো।

স্বাস্থ্যের প্রতি যেমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, প্রোপ্রাইটর হয়তো ভোরের হাওয়ার জন্যে নদীর ধারে সুভদ্রাকে পাঠিয়ে দিয়েছে বেড়াতে। কিন্তু সমস্ত ঢাল গ্রাস করে নদী এখন প্রায় রাস্তার ধারের বাড়িগুলি ছোঁয়-ছোঁয়, এখন এখানে বেড়াবার জন্যে ফাঁকা জায়গা কোথায় ? অতুলের আন্দাজটাই ঠিক, সুভদ্রা হাওয়া খাচ্ছে না, একটা মাঝারি আকারের পিতলের গামলাতে করে চাল ধুচ্ছে।

'একি, সার্কাসের মেয়ের এ কী কাজ ?'

সুভদ্রা মৃদুরেখায় হাসলো। বললে, 'কেন, সার্কাসের মেয়ে ভাত খাবে না ?'

তা হয়তো খাবে কিন্তু চাল ধোবে কেন ?'

'তবে কে ধোবে?'

'কেন, চাকর!'

'ইস্, চাকর! কেন, আমার এ হাত দুটো কী দোষ করেছে!' বলে সুভদ্রা তাকালো তার দুই কর্মলিপ্ত বলিষ্ঠ বাহুর দিকে এবং তক্ষুনি অতুলের উৎসুক চক্ষুর সঙ্গে দৃষ্টির সংঘর্ষ হতেই ঈষৎ শিউরে উঠলো। কিন্তু সে লজ্জা, সে আনন্দস্পন্দটুকুকে সে মিলিয়ে দিল এক ফুঁয়ে। বললে, 'শুধু চাল ধোয়া কী, এখন গিয়ে সবার জন্যে রান্না করবো আমি। উনুন ধরিয়ে এসেছি দুটো। ঝাটপাট, জামা-কাপড় কাচা, কখন সব শেষ হয়ে গেছে—আপনি তো ঘুমুচ্ছিলেন দিব্যি। রান্নার পরে আবার বাসন-মাজা, জল তোলা—কত কাজ, কাজের কিছু শেষ আছে? আর, সার্কাসের মেয়ে ছাড়া কেউ পারবে এত কাজ করতে?'

এ কি শুধু স্পর্ধা, না এতে একটু বিষাদ একটু-বা বিতৃষ্ণা আছে অনুচ্চারিত?

মেয়েদের পক্ষে গেরস্থালির কাজ করা তো ভালই, বিশেষত ভারতীয় মেয়েদের এই তো আদর্শ, অতুল এমনিধারা একটা বিবর্ণ বক্তৃতার অংশ আওড়ালো। কিন্তু কথাটা তো তা নয়, অবস্থা যাদের ভালো, সমাজে যারা সম্ভ্রান্ত, তারা এই সব তুচ্ছ পরিশ্রমের কাজগুলি চাকর-ঠাকুরকে দিয়েই করায়।

'হাঃ, ঠাকুর রাখবে! কী বা সম্ভ্রম আর কী বা জোটে সার্কাসে!' সুভদ্রা একটা হতাশ্বাসের শব্দ করলো।

এই সূত্রে জানা গেল সুভদ্রার পৃষ্ঠপটটা। দি রিগ্যাল সার্কাসের প্রোপ্রাইটরের নাম সংক্ষেপে তাতাচারী, বয়েস প্রায় পঞ্চাশ, স্ত্রীর নাম কৌশল্যা। মন্থরা রাখলেই নাকি ঠিক হতো, চরিত্রের দিক দিয়ে। তবে এক হিসেবে কৌশল্যা নামটাও নাকি সার্থক, কেননা বহু সন্তানের বোঝা টেনে-টেনে পঙ্গু হয়ে পড়ার পর থেকে তাতাচারী নাকি একটি কৈকেয়ীর

সন্ধান করছে। সুভদ্রা কৌশল্যার ছোট বোন, লতাপাতা ছেড়ে আগাছার সম্পর্কে। শৈশবেই বাপ-মা হারিয়ে পড়েছে এই বোনের খপ্পরে, ক্রমে ক্রমে তাতাচারীর আয়ত্তের মধ্যে। তাতাচারী যৌবন থেকেই উদ্দাম, ভাগ্যান্বেষী। ঘুরেছে অনেক দেশ, কোনো কিছুতেই মন বসেনি। শেষ পর্যন্ত সার্কাস নিয়ে যে আছে, সে শুধু জায়গায় জায়গায় ঘুরতে পাবে বলে। এককালে ইস্কুল-মাস্টার ছিল বলেই সার্কাসে বাঘের মাস্টার হতে পেরেছে। মেয়ে জাতটার প্রতি তার মমতা নেই, তাই সুভদ্রা না-হয় পর, নিজের মেয়েগুলোকে পর্যন্ত সার্কাসে নামিয়েছে। যদি মেয়েগুলোর শরীর ভালো থাকে, আলুনি না হয়ে যায়, তবে চিরকালই ওদেরকে এমনি নাচাবে, বিয়ে দেওয়াবে না। যে স্বাস্থ্য ও শক্তি ওদের হলো, সে আর-কোথাও সম্পদ হয়ে উঠতে পারবে না, লাগবে শুধু সার্কাসের বিজ্ঞাপনে।

'কিন্তু তোমরা ছাড়া আরো মেয়ে তো আছে—'

'আছে বৈকি। ঐ যে দাঁতের খেলা দেখায়, সে তো আর্মিনিয়ন মেয়ে, আর ঐ চুল দিয়ে যে গাড়ি টানলো সে একটা জুয়েস। ওদের কথা বলবেন না, ওরা যাচ্ছেতাই, যেমন দেখতে তেমনি শুঁকতে। পয়সার জন্যে এসেছে, পয়সার জন্যে ভেসে যাবে। কিন্তু যে যাই বলুক, যদ্দিন আমি আছি, তদ্দিনই সার্কাসের জৌলুস।' চোখে ঝিলিক দিয়ে সুভদ্রা হাসলো।

'কেন, ছেলেরাও তো আছে।'

'হ্যাঁ, নাগস্বামী আছে, আছে রত্নসভাপতি, আছে রামানাথন। কিন্তু এক রাত্রে আমাকে আর রত্নাকে বাদ দিয়ে দিন, দেখবো জলে কেমন ডে-লাইট!'

'এত যখন তোমার প্রতিপত্তি, তখন তো সার্কাসের খুব ভালো অবস্থা!'

'হওয়াই তো উচিত! কিন্তু শুনতে পাই শুধু, ধার আর ধার। তাঁবুটা

সেলাই হয় না, দড়ির নেটটা ফাঁক হয়ে থাকে। আর বারে-বারে আমাকে শুধু একই পোশাকে এসে সেলাম ঠুকতে হয়।' সুভদ্রা উঠে দাঁড়ালো।

'ধার—এত ধার কিসে?'

'যে-মেয়েটা পিপের খেলা দেখালো শুয়ে-শুয়ে, তার চিকিৎসার জন্যে নাকি সর্ব্বস্ব শেষ হয়ে গেছে তাতাচারীর—'

'কই, কে আবার পিপের খেলা দেখালো?'

সুভদ্রারই সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফেরালো অতুল। দেখলো সামনেই তাতাচারীর বপুষ্মতী মেদমন্থরা সুবিশালা স্ত্রী এক চোখে কৌতূহল ও অন্য চোখে ক্রোধ নিয়ে আছে দাঁড়িয়ে।

সুভদ্রা বললে, 'আমি সার্কাসের মেয়ে, ভয় করিনে।'

দুপুরের দিকে সুভদ্রাকে আবার পাওয়া গেল নদীর ঘাটে, সঙ্গে এক কাঁড়ি বাসন।

অতুল বললে, 'যাই বলো, তোমার জোর করা উচিত।'

'কিসে?'

'ঠাকুর-চাকর রাখা নিয়ে। তোমার দামে নিশ্চয়ই দুটো ঠাকুর-চাকর রাখা যায়।'

'তা কে না জানে? ঠিকমতো মাইনে পেলে এদ্দিনে আমার একটা মোটর গাড়ি হতো। অন্তত কিছু গয়না।' তাকালো বুঝি একবার রিক্ত গলা ও মণিবন্ধের দিকে।

'কিছু আছে নাকি এখানে মাইনে?'

'পরিবারের জন্যে খাটছি, তায় আবার মাইনে কী!'

'পরিবারের জন্যে!'

'তা ছাড়া আবার কী? আমার আর কে আছে!' শেষের দিকের কথাটা একটু কাতর শোনালো বোধ হয়।

'না, তোমার এর প্রতিকার করা উচিত। মানায় না তোমাকে এসব নোংরা কাজে।'

'বলো কী! এই তো আসল কাজ। নইলে সারা জীবন কি দুলবো নাকি গাছে চড়ে?' সুভদ্রা লজ্জালু চোখে হেসে উঠলো। পরে খুব জোর দিয়ে বাসন মাজতে-মাজতে বললে, 'এসব কাজের জন্যেই তো শরীরের শক্তি ধরা সার্থক আমাদের।'

'না, মোটেই ভালো দেখায় না তোমাকে—' কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর অতুল বললে।

'ভালো দেখায় না?' আঘাতের মতো কথাটা লাগলো যেন সুভদ্রার। চমকে উঠে বললে, 'কেন? কিসে?'

'এই কাজের ভঙ্গিতে। পোশাকে।'

'ওমা, পোশাক আবার কী দোষ করলো?' সুভদ্রা সন্ত্রস্ত হয়ে শাড়ির হ্রস্বতাগুলোকে বিস্ফারিত করবার চেষ্টা করতে লাগলো।

'এই শাড়ির চেয়ে তোমার সার্কাসের পোশাকটা অনেক সুন্দর, অনেক তেজী।'

'ওমা কী লজ্জা!' মাথা ঝুঁকিয়ে অনুচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো সুভদ্রা।

'আমি যদি সার্কাসের কর্তা হতাম বদলাতে দিতাম না তোমাকে ঐ পোশাক।'

'কী সর্বনাশ! ভীষণ কুচ্ছিৎ দেখাতো যে আমাকে।' বাহুর আড়ে মুখ লুকিয়ে হাসির আরেকটা ঢেউ সুভদ্রা শেষ করলো।

'তুমি তো কত বোঝো! কুচ্ছিৎ দেখায় তো খেলার সময় পরো কেন ঐ পোশাক?'

'বা, ও তো খেলার সময়। যখন শরীরটা ঘুরছে, দুলছে, জট পাকাচ্ছে। যখন কেবল ছোটা আর চক্কর খাওয়া, চুপচাপ শুয়ে-বসে থাকা নয়। তখন তো শরীরটাকে শরীর বলেই মনে হয় না একদম। এখন—এখন

যেন কেমন ভার-ভার মোটা-মোটা লাগে, কেমন এলোমেলো। তাই নয়?'
'এখন একেবারে যাচ্ছেতাই। চেনাই যায় না তোমাকে। সেই আঁট, ডাঁটো শরীর দেখায় এখন কেমন ঢ্যাবঢেবে।'
'দেখাক।' সুভদ্রা যেন রাগ করে উঠলো, 'তাই বলে আমি সত্যিকারের যা তাই হবো না? চিরকাল ঝুলবো শুধু শূন্যে, মাটিতে নেমে আসবো না? কুটবো না কুটনো, মাজবো না বাসন?'
'না, হবে না বাসন মাজতে।' বাজের হুমকির মতো চেঁচিয়ে উঠলো কে রাস্তার উপর থেকে। দেখলো, তাতাচারী স্বয়ং। শুকিয়ে মুখ এতটুকু হয়ে গেল সুভদ্রার।

শুধু ইঁট-কাঠ দিলে চলবে না, নগদ টাকা দিতে হবে। ক'দিনের খরার পর বৃষ্টি শুরু হয়েছে, তাঁবু গিয়েছে চুপসে, ভিজে সপসপ করছে নিচের সতরঞ্চি। ছেদ বুঝে ব্যাণ্ড বাজাতে চাইলেও লোক জমছে না। খেলুড়েদের হজম হচ্ছে না ব্যায়ামের অভাবে।
এমনি যখন অবস্থা তখন তাতাচারীকে নরম করবার জন্যে অতুলের ইচ্ছে করলো বলে, পথ দেখ। কিন্তু তাতাচারি পথ দেখলে সুভদ্রাও বেরিয়ে যায়, তাই জিভের ডগা থেকেই কথাটা ফিরিয়ে নিতে হয়। কি আশ্চর্য, এক বাড়িতে থাকবে, আতিথেয়তার প্রশ্রয় নেবে ষোলো আনা, কিন্তু কিছুতেই ঘনিষ্ঠ হতে দেবে না, তাতাচারীর এ কী অত্যাচার! তাকে না জানিয়ে তারই বাড়িতে যেখানে-সেখানে সে বেড়া তুলবে এই বা কেমন ব্যবহার।
কিন্তু ঝগড়া করে লাভ নেই। টাকা দিতে হবে কোনোরকমে। কিন্তু, টাকা শুধু রোজগার করাই কঠিন নয়, ঠিকমত অপব্যয় করবার জন্যেও সুবর্ণসুযোগের দরকার।
শেষে কিছু হদিস না পেয়ে অতুল একটা সোনার হার কিনলো।

তাতাচারীকে বললো, 'এমন সুন্দর খেলা সুভদ্রার, ওকে একটা উপহার দেব।'

'কি, মেডেল?' উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তাতাচারীর চোখ।

'না নেকলেস।'

ম্লান চোখে মুখ গম্ভীর করে তাতাচারী বললো, 'না মাফ করবেন, ও-সব হাল্কা জিনিস পারবো না নিতে।'

'হাল্কা জিনিস? দেখুন না ওজন! সাত আট ভরির কম হবে না। আর দাম কত আন্দাজ করতে পারেন?'

'অত দামী বলেই তো জিনিসটা হাল্কা। ও গলায় পরলে মনটা নরম মেয়েলি হয়ে আসবে, চোখেও লাগবে একটু সোনালি ভাব, সেটা সার্কাসের মেয়ের পক্ষে ঠিক নয়। সার্কাসের মেয়ে হবে শক্ত, মজবুত, বুকে তারা পাথর ভাঙবে, মোটর তুলবে। ও-সব হার গলায় দিয়ে বাইজি সাজবার তাদের পার্ট নয়। তার চেয়ে মেডেল দিন, যত খুসি, অনেক মান বাড়বে সুভদ্রার।'

সুভদ্রারই নিজের কথা তাতাচারীর মুখের উপর ছুঁড়ে মারতে ইচ্ছে করলো। তার বুক কি শুধু ভার বইবার জন্যে, হার বইবার জন্যে নয়? সে কি নরম হবে না কোনো দিন, নরম বলে বুঝবে না কোনো দিন নিজেকে? সে কি চিরকাল নিক্ষিপ্ত হবে শূন্যে, নেমে আসবে না মাটির স্বত্ব-সীমায়? কিন্তু এ-সব কথা বলে কি-করে? এর একটাও যে অতুলের নিজের কথা নয়।

কিন্তু এক দিন সুযোগ এলো। আর্মিনিয়ন মেয়ে তার খেড়ীসমেত কলকাতা চলে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। তাতাচারী মিটিয়ে দিক তাদের সর্তের টাকাকড়ি। দুশো টাকার উপর। তাতাচারী বললে, টাকা কোথায়?

ঝগড়াটা জিহ্বাগ্র থেকে অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রায় সঞ্চারিত হচ্ছে, এমনি

সময় অতুল এসে মাঝে পড়লো। বললো দাঁতের খেলাটা সে কিনে নেবে। আর্মিনিয়নদের মিটিয়ে দিল পাওনা, বাধ্য করলো তুদশ দিন আরো থেকে যাওয়ায়। বললে, শরতের নীল ধরেছে আকাশে, মেঘ শাদা হয়ে আসছে, বৃষ্টি এই তাঁবু গুটোলো বলে। এখনো চাষীদের ঘরে ধানের পাহাড়, এখনো তারা ঘটি-বাটি পৈঁছে-খাড়ু বেচতে শুরু করেনি। হাঁটতে শুরু করেছে পয়সা, দেখা যাক আরো এক হপ্তা, হয়তো দৌড়ুতে শুরু করবে।

রামানাথন আস্ত-আস্ত জ্যান্ত মাছ গিলে খায়, আর আস্ত-আস্ত সেই জ্যান্ত মাছ উগরে ফেলে ফের টামব্লারের জলে। সত্তর টাকায় তার খেলাটাও সে অতুলকে বেচে ফেললে।

নাগস্বামীকে বললে অতুল, 'তোমার খেলাটাও বেচ না। যত তুমি চাও।'

লজ্জিত হাসি হেসে নাগস্বামী বললে, 'সুভদ্রাকে ছাড়া আমার খেলার দাম কী। সুভদ্রা কি বেচবে?'

সুভদ্রার খেলার মালিক সুভদ্রা নয়। কিন্তু তাতাচারী রাজী হবে কেন? সে কি আর ব্যবসা বোঝে না?

'বাবুজী।' নাগস্বামী ডাকলো।

অতুল তাকিয়ে দেখলো নাগস্বামীর কালো তুই চোখে ছুরির ফলার মতো একটা মতলোব চকচক করছে।

'ও-সব খুচরো খেলা কিনে নিয়ে লাভ কী বাবুজি, কত আর পাবে মুনাফা? নতুন একটা নিজের সার্কাস খোলো।'

বৃষ্টি ধরে যাওয়াতে এখন ফের শো শুরু হয়েছে, কাতারে-কাতারে আসছে আবার গ্রাম-গ্রামান্তরের লোক। তু-তুটো খেলার মালিক হয়ে আনুপাতিক মুনফা যা পাচ্ছে অতুল, তা তার আশার অনেকখানি উপরে। এখন নাগস্বামীর কথায় আশাটা প্রায় তাঁবুর মাস্তুলের কাছাকাছি এসে ঠেকলো।

'তুমি আসবে?' অতুল নাগস্বামীর হাত চেপে ধরলো।

'আমার আসতে কতক্ষণ! কিন্তু কথা হচ্ছে সুভদ্রাকে নিয়ে—'

'আসবে না সুভদ্রা?'

'আসা তো উচিত। এখানে তো ওকে শুষে নিচ্ছে তাতাচারী। আর ওর ভবিষ্যৎ কী। রত্নার মা মরবে আর তাতাচারী বিয়ে করবে ওকে। ও কি বুঝতে পাচ্ছে না কিছু?'

'তবে তুমি একবার চেষ্টা করো।'

'তুমি চেষ্টা করলেই হবে। টাকা, টাকাই যথেষ্ট। আমার যদি টাকা থাকতো তবে কত কী করতে পারতাম! টাকা নেই তো কিচ্ছু নেই।' নাগস্বামী একটা নিশ্বাস ফেললো।

অতুলের টাকা আছে বলেই কি সব আছে—একবার ভাবলো অতুল। কে জানে, কে বল্‌তে পারে! দেখা যাক না সার্কাসের তাঁবু মেলে, দোলনা দুলিয়ে।

ভিতরে থেকে নাগস্বামীই বন্দোবস্ত করে দিলে। সেকেণ্ড শো'র ঠিক শেষ হবার আগে পুরুষখেলোয়াড়দের পরিত্যক্ত তাঁবুতে, খোলা গ্যাসের আলোয়। সুভদ্রার তখন সার্কাসের পোশাক। খোলা থামের আলো কেঁপে কেঁপে কখনো আভা কখনো বা ছায়া ফেলে পুবস্ত রেখাকে মৃদু ও মৃদু রেখাকে পুরস্ত করে তুলছে।

নাগস্বামীর কথাতেই সুভদ্রা বুঝতে পেরেছে যেন ষড়যন্ত্রের আভাস, তাই ঝাপসা গলায় জিগ্‌গেস করলে: 'কী?'

'আমার সঙ্গে যাবে?'

'কোথায়?'

'আমি নতুন সার্কাস খুলছি—সেই দলে। সবাই আসছে—তুমি যদি আস—'

'আবার সার্কাস!' সুভদ্রা যেন থেমে পড়লো।

'হ্যাঁ, এইখানে যখন সার্কাস, তখন আবারো সার্কাস বই কি। কিন্তু

এইখানে শুকনো, শূন্য, ওখানে নগদ টাকা—এই দেখ, পাঁচ শো—'
অতুল পকেট থেকে এক তাড়া নোট বের করে ধরলো।
'কত বললেন? পাঁচশো? সর্বনাশ! শুনতেই পারবো না।' কথাটা উড়িয়ে দিলে সুভদ্রা। যেন এটা উড়িয়ে দেবার কথা!
অতুল বললে, 'সিজন নয়, মাস-মাস মাইনে। রেজেষ্ট্রি করে নেবে ডিড। তোমার নিজেদের দলের লোক সব সাক্ষী হবে। কি, ঠকাবো ভাবছ? আরো যারা আসছে—'
'না, না, ঠকাবেন কেন? এর চেয়ে বেশি আর আমি কী ঠকতে পারি বলুন? কিন্তু কথাটা তা নয়। বলি, নতুন কিছু খেলার কথা ভাবতে পারেন না? সেই সার্কাস, সেই দোল খাওয়া, সেই টোল খাওয়া, আর সেই ঘোরা আর ঘোরা? তবে তাতাচারী কি দোষ করলো?'
'শোনো—'
'বেশি সময় নেই। তাতাচারী আসছে এদিকে।'
'আসুক। সার্কাসের মেয়ে, সার্কাস ছাড়া নতুন খেলা আর কী দেখাবে তুমি? পাঁচশোতে না পোষায়—'
নাগস্বামীর দিকে তেরছা একটা চাউনি হেনে সুভদ্রা বিদ্যুতের মতো গেল মিলিয়ে।
অতুল বেরিয়ে এসে বললে, 'আর একবার সুবিধে করে দাও। কালকেই। ঠিক মতো জায়গায় টোকা মারা হয়নি। দেখি শেষ চেষ্টা করে।'
নাগস্বামী বললে, 'আচ্ছা।'
পরের রাতেই আবার নাগস্বামী বন্দোবস্ত করলে। সেটা বৃষ্টি-ফোঁপা রাত, হাওয়ার চাবুক-খাওয়া। অন্ধকার যেন হেঁটে-হেঁটে বেড়াচ্ছে। ডাকছে না ঝিঁঝিঁ, জ্বলছে না জোনাকি। নিজের কানে নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ শোনবার মতো স্তব্ধতা।

জ্বলছে সেই খোলা গ্যাস, কিন্তু তার শিখাটা আজ বেশি কাঁপছে। নাগস্বামী অদূরে দাঁড়িয়ে আছে বটে পাহারায়, কিন্তু অন্ধকারে তার অস্তিত্বের কোনো অনুভব নেই।

তেমনি নির্ভীক পোশাকে নির্ভয় সুভদ্রার আবির্ভাব।

'কি, নতুন খেলা ভাবতে পারলেন কিছু?'

'পেরেছি।'

গলার স্বরে চমকালো সুভদ্রা। বললে, 'কী?'

'পাঁচ শোর দ্বিগুণ। যাতে গুনতে না অসুবিধে হয়, দশখানা নোট এনেছি একশো টাকার।' বলে অতুল সুভদ্রার ডান হাতটা ধরে ফেললো। অতুলের হাতটা গরম, এত লুফালুফি করেও ধরাটা সুভদ্রার অজানা।

সুভদ্রা হঠাৎ ভঙ্গিটা কঠিন করে বললে, 'কী করবো ঠিক কিছু ভেবে উঠতে পারছি না, অতুলবাবু। হাতটা ছাড়িয়ে নেব, না, বাঁ হাত দিয়ে গলাটা টিপে ধরবো আপনার?'

অতুল হাতটা ছেড়ে দিল। বললো, 'তার চেয়ে দু হাতে জড়িয়ে ধরতে পারো গলাটা।' বাপের বরাদ্দ পাঁচসিকে আজ পাঠায়নি নাকি অতুল? কী হলো তার হঠাৎ?

'দু হাত দিয়ে গলা জড়াবার মানুষ আপনি নন। পলকা ঘাড়ে পারবেন না ভার সইতে। মটকে যাবে।'

'অত দেমাক কিসের, কেউই সইবে না ঐ ভার। সার্কাসের মেয়ে, শরীর দেখিয়ে যার বাহবা, তার আবার স্পর্ধা কী! কে আসবে আর ঐ নিধানী মাঠের কাছে? কে বিশ্বাস করবে, আছে আর এতে শ্যামলের পরিচয়? তোমার পক্ষে হাজার টাকাটা কম ছিল না, সুভদ্রা।' দুর্বল হাতে অতুল আবার নোটগুলি মেলে ধরলো।

'এই তো—এই তো শেষ কথা?' সুভদ্রা ব্যস্ত হয়ে বললে, 'না, আরো কিছু আছে?'

কাঁপতে-কাঁপতে গ্যাসের শিখাটা আবার স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নোটগুলি পকেটে পুরে রাখতে-রাখতে অতুল ক্লান্ত গলায় বললে, 'কেন, এত ব্যস্ত কেন?'

'না, তাতাচারী দেখে ফেলবে কখন।'

'তাতাচারীকে অত ভয় কিসের?'

'তাতাচারীকে ভয় নয়। অন্যায়কে দেখে ফেলে একজন ঠিক তাকে অন্যায় বলেই চিনবে, তার ভয়।'

'বলিহারি তোমার পছন্দ, সুভদ্রা। যেমন নিজে মোটাচ্ছ তেমনি প্রবৃত্তি-গুলিও মোটাচ্ছে। অন্যায় যে কোনটা তাই চিনতে পাচ্ছ না।' অনেক শান্ত, নিরাসক্ত অতুলের স্বর: 'নইলে ঐ বুড়ো ধুমসো তাতাচারী তোমার গলা জড়াবার মানুষ?'

'মন্দ কী!' ছুটে বেরিয়ে গেল সুভদ্রা, আর যাবার সময় নাগস্বামীকে দিয়ে গেল একটা প্রবল ধাক্কা। নাগস্বামী ধরতে গেল তাকে হাত বাড়িয়ে, পারলো না।

অতুল বললে, 'এই হাজার টাকা তোমার। আর এই বোতল।'

নাগস্বামী টাকাটা নিলো। কিন্তু বোতলটা ছুঁলো না। বললে, 'রক্ত এমনিতেই জ্বলছে বাবুজি।'

অতুল চাপা গলায় বললে, 'ভুল হবে না তো?'

'আজ এত বচ্ছর ওকে হাত বাড়িয়ে লুফে নিচ্ছি, ছুঁড়ে দিচ্ছি আবার হাতের ঘেরা থেকে, ভুল হবে আমার? ওর শরীরের প্রত্যেকটি ঢেউ আমার মুখস্ত, বাবুজী।'

'নেটটার মাঝখানটায় একটু—'

'না, না, উত্তরের দিকে যে ছেঁড়া আছে, তাই যথেষ্ট। ওখানে থামটা আছে বলেই আরো সুবিধে। টক্কর খেয়ে ঠিক গলে যাবে দেখবেন।'

তুমুল লোক হয়েছে সেদিন, আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেলেও। গ্যালারির ভিড়ে রুদ্ধশ্বাসে বসে আছে অতুল, আর উপরে চলেছে দোলনার খেলা।

মিথ্যে কথা, নাগস্বামী রাজি নয় সর্ত-পালনে। যতবারই সুভদ্রা ঝাঁপিয়ে পড়ছে শূন্যে, ততবারই নাগস্বামী তাকে লুফে নিচ্ছে আলগোছে, আর যতবারই ছুঁড়ে দিচ্ছে সুভদ্রাকে, ততবারই সে অবহেলায় ধরে ফেলছে তার নিজের দোলনা। সমস্তটাই যেন একটা অভ্যেস, তৈলাক্ত কোমলতা।

না, নাগস্বামীকে দিয়ে হবে না, ওর হাত মেলে-দেয়ার মধ্যে বা যেন একটি মমতার ভাব আছে। যাক হাজার টাকা, অন্য রাস্তা ভাবতে হবে। যে করে হোক, গুঁড়ো করে দিতে হবে সুভদ্রার স্পর্ধা, তার শরীরে ঐ পোশাকের ধৃষ্টতা।

এমন সময় প্রকাণ্ড একটা পিণ্ডাকার শব্দ, সঙ্গে-সঙ্গে শতকণ্ঠের সমবেত কাতরতা। নাগস্বামীর হাত থেকে উড়ন্ত অবস্থায় নিজের দোলনা ধরতে না পেরে সুভদ্রা পড়ে গেছে মাটিতে, উল্কার মতো ছিটকে। আর পড়বি তো পড়, নেটের মাঝখানে নয়, উত্তর প্রান্তে যেখানটা ছেঁড়া ঠিক সেই বরাবর।

খেলতে-খেলতে ওরা দুজনেই আজ ভীষণ মেতে গিয়েছিলো, নানান রকম নতুন ভাঁজ ও ভঙ্গি দেখাচ্ছিলো নাকি। একটা ছিলো উড়ন্ত অবস্থায় শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে নিয়ে দোলনা ধরা। তারই শেষ লাফটাতেই এই দুর্ঘটনা। লোকে বললে, সুভদ্রারই হঠকারিতার জন্যে এটা ঘটেছে। অন্তত নাগস্বামী এই ভেবে ব্যাপারটা সাজিয়েছে যেন লোকে বলে সুভদ্রার হঠকারিতা।

সুভদ্রা অজ্ঞান, লেগেছে ঠিক নিতম্বের অস্থিতে। শোয়া চেয়ারে করে নিয়ে যাওয়া হলো স্থানীয় হাসপাতালে। এ-হাসপাতালটার নিজেরই

প্রায় য়্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে যাওয়ার দাখিল; সুতরাং রাত্রের ট্রেনেই সদর। সদর বললে, দুঃসাধ্য। চলো কলকাতা।

ক্যাবিনে থাকতে হলো প্রায় এক মাস। সেখান থেকে ছোট একটা ভাড়াটে বাড়িতে। সমস্ত খরচ জোগালে অতুল, শুশ্রূষা করলে নাগস্বামী, আর তাতাচারী নতুনতরো রুগ্নতার সামনে শূন্য চোখে চেয়ে রইলো। ডাক্তার বললে, খোঁড়া হয়ে যাবে চিরকালের জন্যে, সার্কাস দূরে থাক, লাঠির ভর ছাড়া হাঁটতেই পারবে না। অতুল দেখলো পোশাকের তিরোধান, নাগস্বামী দেখলো দর্পের আর তাতাচারী পুনরুত্থানের।

যেদিন প্রথম বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াবে সুভদ্রা, সেদিন তার বিছানার পাশে তিনজনই ছিল, তাতাচারী, অতুল আর নাগস্বামী। আরো অনেক আত্মীয়-আত্মীয়া। কিন্তু সবাইকে ফেলে, এমনকি লাঠির আশ্রয় ফেলে, নাগস্বামীর কাঁধের উপর বাহুর ভর রেখে সুভদ্রা উঠে দাঁড়ালো। নাগস্বামী তাকে টেনে নিল সার্কাসের চেয়েও কোমলতর অভ্যাসে।

এক পা দু পা হেঁটে সুভদ্রা প্রশ্ন করলে নাগস্বামীকে: 'আচ্ছা, তুমি আমাকে নিজে ইচ্ছে করেই ফেলে দিয়েছিলে, না?'

'কেন, তুমি বুঝতে পারোনি এত দিন?'

'বুঝেছি, কিছু সম্পূর্ণ বুঝতে পারিনি।' পরিপূর্ণ চোখ তুলে সুভদ্রা বললে, 'কেন ফেলে দিয়েছিলে বলো দিকি?'

'বা, এ আবার কে না বোঝে?' হাঁটতে-হাঁটতে এগিয়ে গেল তারা ভোরের জানালার দিকে। নাগস্বামী অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'নইলে তোমাকে বিয়ে করতুম কি-করে?'





শেষচিঠি

তুমি এমন কোনো মুখ দেখেছ যে-মুখে চক্ষু নেই? অন্ধের মুখ নয়, তার দৃষ্টি নেই, কিন্তু তারো চক্ষু আছে, মুক্ত না হোক মুদ্রিত চক্ষু। অন্তত চক্ষুর একটা আভাস বা অবশেষ আছে। আমি সে-মুখের কথা বলছি না। ভাবতে পারো এমন মুখ যা নিশ্ছিদ্র নিশ্চক্ষু? অর্থাৎ যে-মুখে চক্ষু যোটেই তৈরি হয়নি। ভুরুর নিচে থেকেই গাল শুরু হয়েছে যে-মুখে। নেই কোটর, নেই বা সূক্ষ্ম পক্ষ্মরেখা। অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে পারো সে-মুখের বীভৎসতা? পাবো না। দিনের আঁলোয়ও সে-মুখ দেখলে হয়তো শিউরে ওঠো।

ওঠো না? তবে আমার সঙ্গে এসো এই গ্রামে।

কী সুন্দর নাম এই গ্রামটার! যে কোনো একটি অচেনা মেয়ের নামের মতোই মিষ্টি। শুনলেই মনে হয় কেমন ছায়া-নিবিড়, নিশীথ-শীতল। নিতান্ত পায়ের কাছে যে মাটি তার থেকে চোখ তুলে বাইরের দিকে তাকিয়ে কে না তা বলবে। এমন কমলারঙের সূর্য, ধানের রঙের আকাশ, স্বচ্ছন্দ কামনার মতো নদী—ইটকাঠ লোহালক্কড় আর গুলি-বারুদের পর দস্তুরমতো শিহরণ আনে। কিন্তু সুন্দর মুখের নিচে যে বিকট কঙ্কাল আছে হাঁ করে, তা আমরা সহজে দেখি কই?

তুমি দেখবে?

লরি নিয়ে গ্রামে এসে পৌছলুম প্রায় বিকেলের দিকে। সঙ্গে ক'খানা কম্বল কিছু কুইনিন আর ক'টা কলেরার ইনজেকশান। কম্বল কাকে-কাকে বিলোতে হবে, লিস্টি আগে থেকেই তৈরি। নাম, বাপের নাম, মেয়ে হলে জওজের নাম, পেশা, জমি থাকলে খতেন-নম্বর। আর যদি কারু দরকার হয় কুইনিনের, দেবো কটা লাল তেতো বড়ি—কিসে তেতো কে জিগগেস করবে? আর এ নিশ্চয়ই জানি, ওলাবিবির পোলারা সহজে রাজি হবে না ইনজেকশানে। ভেবেছিলুম, খুব হাল্কা কাজ। সন্ধ্যের আগেই ফিরতে পাবো তাঁবুতে।

'তোমার লিস্‌টিতে যারা দুঃস্থ, তাদের সবাইর জমি আছে?' সঙ্গী সহকর্মীকে জিগগেস করলুম।

'কেন, ঐ খতেন-নম্বর আছে বলে?'

'হ্যাঁ। যাদের জমি আছে তাদের তো ধানও আছে। বেচবার না হলেও খাবার, অন্তত একবেলার খাবার। তোমার কি মনে হয় না, যাদের জমি নেই, জমিহীন যে-সব মজুর বা মুনিষ, ঘরামি বা ছুইয়াল—তারাই সব চেয়ে বেশি দুঃস্থ?'

'সন্দেহ কী!'

'তাদের নাম নেই তোমার লিস্টিতে?'

'তাদের চেনে কে বলো? কে তাদেরকে সনাক্ত করবে?'

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকলুম। বললুম, 'কেন, রোগ আর মৃত্যুও কি ওদের চেনে না বলতে চাও?'

সহকর্মী হেসে উঠলেন। বললেন, 'এমন বহু লোক আছে যারা ভাগরায় চাষ করে। জমিটা শুধু ধরা হয়েছে আইডেন্টিফিকেশনের সুবিধের জন্যে। মানিক মণ্ডলই আছে হয়তো পাঁচজন, বাহার আলিই হয়তো সাতটা। কাকে ফেলে কাকে রাখি? তাই একটা কিছু দিয়ে নিশানদিহি করার জন্যে জমির সম্পর্ক বের করা হয়েছে।'

'তার মানে, যে-মানিক মণ্ডলের জমি আছে সে যে-মানিক মণ্ডল জন খাটে তার চেয়ে বেশি দুঃস্থ? কে করেছে এই লিস্টিটা?'

'গ্রামের মুরুব্বি। দি ম্যান অন দি স্পট।'

তুমি কিছু বুঝতে পারছ এর গূঢ়ার্থ? পারছ না? আড়াআড়ি, লড়ালড়ি লেগে গিয়েছিলো প্রার্থীদের মধ্যে। তাই যারা মুরুব্বির মরাইয়ের ধান পৌঁছে দিতে পেরেছে, আড়িতে না হোক পালিতে, পালিতে না হয় খুঁচিতে, তারাই পেয়েছে কম্বলের সুপারিশ। খড় ছাড়া কে কবে ইট তৈরি করেছে শুনি?

'ও সব সমান।' সঙ্গী একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করলেন। 'ঘাড় থেকে বোঝাটা নামিয়ে দিলেই খালাস। আর, সত্যি-সত্যি যারা পাবে, দেখো, তারাও গরীব।'

'তেমনি গরিব তো আমরাও।'

'কেন, তোমার কি চাই না কি একখানা?' সঙ্গী চোখ ছোট করলেন।

'না।' বললুম সংক্ষেপে।

বাঘের হাই দেখেছ? তেমনি চার দিকে দুর্ভিক্ষের শূন্যতা হাই তুলে আছে।

অথচ, তুমি বিশ্বাস করবে না মাঠ ভরা অঢেল ধান। বাঁকুই, লখনা, নাগরা। সবুজে-হলদে মেশামেশি। এত ধান যে কাটবার জন্যে দাওয়াল পর্যন্ত জুটছে না। এত ধান যে সঞ্চয়ীদের লুব্ধ ভাণ্ডার আবার স্ফীতকায় হয়ে উঠেছে। এত ধান তবু এত ক্ষুধা!

ধান আছে, বিধান নেই, কে যেন সর্বক্ষণ বলছে তোমার কানে-কানে।

তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না, এরি মধ্যে মদ চোলাই হচ্ছে, সুদ খাচ্ছে, ঘুস খাচ্ছে, ওজনে জোচ্চরি করছে, ভুল হিসেব দিচ্ছে আর নির্দোষ কন্যার সতীত্বহানির নিস্পন্দ সাক্ষী হচ্ছে তার বাপ-মা।

আর, এও কি ভাবতে পারো, তোমার কলকাতায় নোটের কার্পেটের উপর নৃত্য করছেন বিলাসী-বিলাসিনীরা? ভাবতে পারো, যে-রাস্তায় তুমি মোটরে করে চলেছ কোনো ফুর্তির জায়গায়, সে-রাস্তায় তোমারই চোখের সামনে টলতে-টলতে পড়ে মরে যাচ্ছে চলমান বুভুক্ষুরা। ঘরে তোমার মুমূর্ষু রুগী, অথচ এ-দোকান থেকে ও-দোকানে তুমি ওষুধ পাচ্ছ না, কেননা জানো না তুমি চোরা-গলির নালী পথ, হয়তো দাবি করছ তুমি ক্যাশমেমো। আড়তে-গুদামে গাদা হয়ে আছে চাল, অথচ চালুনির সঙ্গে ছুঁচের ঝগড়া বলে সে-চাল তোমার ধুচুনিতে এসে পৌঁছুচ্ছে না। আমার তোমার ও আমাদের নিচেকার লক্ষ-লক্ষ জীবন নিয়ে ছিনিমিনি

খেলছে শকুনি-গৃধিনীর দল, যারা বেনে আর বনেদী। কী যায় আসে তাদের একটা মৃত্যুতে, যদি তাতে এক মুঠো মুনফা তারা বেশি পায়!

দেখলুম কে একটা লোক গাছতলায় বসে বাঁ হাতের পাঁচটা আঙুল মেলে ধরে ডান হাতে একটা একটা করে গুনছে সে আঙুলের নম্বর, আর বলছে বিড় বিড় করে—'এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ।' সামনে ছেঁড়া কলাপাতায় ডালে-ঝোলে মাখা ক'টা করকরে ভাত, কিন্তু তার দিকে লক্ষ্য না রেখে লোকটা শুধু আঙুল ধরে-ধরে গুনে চলেছে: 'এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ।' কখনো খুব তাড়াতাড়ি, কখনো বা থেমে-থেমে, দম নিয়ে। 'কী হয়েছে তোমার?' এগিয়ে এসে জিগ্‌গেস করলুম।

পিছু-ছুটে ধরে ফেলা কয়েদীর মতো চেহারায় তাকালো লোকটা। বাঁ হাতের সব ক'টা আঙুল মেলে ধরে সে শুকনো গলায় বললে, 'এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—পাঁচ পাঁচটা ছেলে আমার মারা গেছে।'

'কি-করে?'

'না খেতে পেয়ে। তার জন্যে আমি খাবো না বলতে চান?' ভয়-পাওয়া খরগোসের চোখে তাকিয়ে পাতাটা সে টেনে নিল কোলের কাছে। 'এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ।' বলে পর পর পাঁচটা গ্রাস সে মুখে তুললো। বললে, 'হাতে আঙুল ছটা হল না কেন বলতে পারেন?'

'ছটা হলে কী হতো?'

'ছটা হলে আমিও যেতে পারতাম ওদের সঙ্গে।' লোকটা আবার খাওয়া শুরু করলো: 'এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ।'

আমার এ-চিঠি যখন পাবে তখন নিশ্চয়ই ভোর হয়ে গেছে। সেই দিনের আলোয় এই বুড়োর শূন্য, বিবর্ণ চোখের অসহায় উজ্জ্বলতাটা তুমি দেখতে পাবে কিনা কে জানে!

আরো কত দূর এগিয়ে এসে দেখি, কে একজন শুয়ে আছে মাঠের কিনারে। নিঃসাড়, যেন বা নির্বিঘ্ন।

কিন্তু অনেকক্ষণ পর নাম বললে, ইদু-গাজী। বর্গায় চাষ করতো কোন সমাদ্দারের জমি। মালেকের লোক মাঠের গোটা ধান কেটে নিয়ে গেছে, তুলেছে খাস-খামারে, দলা-মলা ঝাড়াই-মাড়াই করে সব নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে এত দিনে। যে চষা-খোঁড়ার কাজ করলো, তার কপালে জুটলো না এক গাছাও খড়, এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে নালিশ করেছিলো সে আদালতে। আজ ছিল শুনানির দিন। সাক্ষী সব ভাগিয়ে নিয়ে গেছে, তবু একাই সে চলেছিলো ধর্মাধিকরণের দরবারে। কিন্তু প্রায় এক হপ্তা সে লাল আলু ছাড়া কিছু খায়নি, যা কিছু ছিল তার সম্বল সব ব্যয় হয়ে গেছে মামলার রশুমে। খেয়ার পারানি পর্যন্ত তার নেই, তাই চলেছিলো সে মাঠ ভেঙে, ঘোরা পথে। কিন্তু কোমর ভেঙে পড়ে গেছে সে ভিরমি খেয়ে। ওদিকে মামলাও তার নাকচ হয়ে গেল। নিজের থেকেও মামলার উপর তার বেশি মায়া!

ন্যায়ের জয় হবে, লুব্ধতার অবসান, হয়তো সেই গোপন একটি অভিলাষের প্রতিই ভীরু স্নেহ।

'সব ধান কেটে নিয়ে গেছে?'

'সব। আর-আর বছর বিড়েয়-বিড়েয় ভাগ হয়ে যেত মাঠে। এ বছর নায়েববাবু সবটাই কেটে কেড়ে নিয়ে গেলেন—দেখতে পাচ্ছ না শুনো মাঠ?'

'তোমার জমি কোনটা?'

'ঐ যে হোথা।'

কোথায় তা কে জানে! কিন্তু নিধানী মাঠের হলুদ উলঙ্গতা দেখতে পেলুম তার শরীরে, তার দৃষ্টির রূঢ়তায়।

'কিছু খেতে দেবেন?' ইদু-গাজী না উঠে বসেই হাত পাতলো।

'খাবারের মধ্যে সঙ্গে কিছু ওষুধ আছে। যদি খেতে চাও তো—' সঙ্গী হেসে একটা অম্লাক্ত শ্লেষ করলেন।

'তাই দিন না। এমন কোনো ওষুধ নেই যা একটুখানি খেয়েই অনেক দিনের খিদে ভোলা যায়?'

সূর্য ঢলে পড়ছে। রক্তাক্ত ক্ষতের মতো দেখাচ্ছে এখন আকাশকে। স্তব্ধতার মাকড়সা জাল বুনে চলেছে শূন্যে।

গ্রামের আরো ভিতরে এসে ঢুকলুম। প্রাণহীন গ্রাম। কাঁচা, তাজা জঙ্গলে যেন বেরুবার কোথাও রাস্তা নেই, সব রাস্তা গেছে ফুরিয়ে। চলেছি যেন কোন নির্বাপিত অঙ্গারের দেশে, মাটির নিচেকার কালো শব্দহীনতায়।

'কী রকম একটা পচা গন্ধ পাচ্ছ না?' নাক সিঁটকে বললে আমার সহচর। কিন্তু সেটা যেন গলিত মাংসের গন্ধ নয়, অনেক দূরে নিপতিত, নিঃসৃত রক্তের।

জঙ্গলের মধ্যে কে-একটা বুড়ি মড়ার দুটো হাড নিয়ে বসে আছে। জলন্ত কয়লার মতো দুটো চোখ, সে-চোখে বার্ধক্য লেখা নেই, লেখা আছে বা অস্তমিত যৌবনের স্তিমিত ভস্মাভা।

একটা শেয়াল পালিয়ে গেল আমাদের দেখে। মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল একটা শকুন, জোরে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা দিয়ে।

'ঐ, ঐ শেয়ালটাই টেনে নিয়ে গিয়েছিলো আমার বাছাকে, আমার বুক থেকে কামড়ে, ছিঁড়ে, ছিনিয়ে নিয়ে। মরে যাবার পরেও দুদিন বাছাকে রেখেছিলাম বুকে করে, বলেছিলাম, মাংস পচে-পচে আমার হাড় তোর হাড় এক হয়ে যাক, তুই যে আমার হাড়ের হাড়, বাবা! কিন্তু হতচ্ছাড়া শেয়াল এসে কখন ওকে টেনে নিয়ে গেল ঘুমের মধ্যি থেকে।'

স্ত্রীলোকটা দুই হাতে মাটি আঁচড়াতে লাগলো আস্তে-আস্তে, হাড়ের অতিরিক্ত আরো কোনো চিহ্নাবশেষ পায় কিনা তারি সন্ধানে।

'তোমরা বলতে পারো এ দুটো কি পায়ের হাড় না হাতের?' নিরুদ্বেগ,

উদাসীন চোখ তুলে তাকালো আমাদের দিকে। 'আমার গায়ের চামড়া ছুলে ফেলে দেখাতে পারো একবার এ-দুটো হাড় আমার কোন হাড়ের সঙ্গে মিল খায়? পারো? না পারো তো পথ দেখ।'

দেখবে না, শুনবেও না? তোমার জানলার পাশে হাসানাহানার ঝাড়ের ওপারে শুঁকবেও না একটু কাঁচা মাংসের গন্ধ?

একটা ঘরে আর্ত শিশুকণ্ঠের চীৎকার শুনতে পেলুম। পরিত্যক্ত, উলঙ্গ শিশু। ঘরে কেউ নেই, কাঁচা মাটির উপর পড়ে-পড়ে কাঁদছে। শিশু একটাও এখনো বেঁচে আছে দেখে আশা হয়, আশ্চর্য লাগে।

'এর মা কোথায়?'

উলঙ্গ মৃতদেহের মতো একটা নিষ্পত্র নিমগাছ আছে দাঁড়িয়ে। তার তলায় বিষণ্ণ একটি নারীমূর্তি। হ্যাঁ, শুধু দরিদ্র নয়, বিষণ্ণ; শুধু ক্ষুধার্ত নয়, অপমানিত। ঐ শিশুটাই যেন তার অপমানের বোঝা।

ছেলে হবার পর সে যখন আঁতুড়ে বন্দী, তখন তার স্বামী দিন-মজুরির সন্ধানে চলে যায় শহরে, বলে যায় জন খেটে কিছু না পাই সিঁধ কেটে কিছু নিয়ে আসবো। আজও এলো, কালও এলো—ক্রমে-ক্রমে হয়ে গেল এই পাঁচ মাস। এতদিন চালিয়েছে সে ভিক্ষা করে, ধুলো খুঁটে, হাড় বা মাসে এতটুকু সার বা শাঁস না রেখে। কিন্তু আর সে পাচ্ছে না, এখন সে চাইছে একটু আলস্য, একটু বিশ্রাম।

তাই সেও গিয়েছিলো আজ খেয়াঘাটে। এইমাত্র বেরিয়ে গেল চালানী নৌকো। না, ধান-বোঝাই ধোলাই নৌকো নয়, মেয়ে-চালানী নৌকো। হ্যাঁ, শহর থেকে ফড়ে এসেছিলো মেয়ে কুড়োবার জন্যে। এখনো শরীরে যাদের মাংসের অবশেষ আছে, আছে বা বয়সের পাণ্ডুলিপি। সেও তাই গিয়েছিলো রপ্তানি হতে। ধর্মের চেয়ে মৃত্যুকে তার বেশি ভয়। কিন্তু ফড়ে তাকে বাতিল করে দিলে। উদ্ধবের পরিবার কাতু গেল, নবী সেখের পরিবার জোলসি বিবি, হিমচাঁদের মেয়ে দিব্যমণি আর দেনাজ

খাঁর বোন শহরবান্থ। শুধু তার গায়েই নাকি মাংস নেই, নেই নাকি যৌবনের এতটুকু ছলছলানি। আর তা ছাড়া—

তা ছাড়া, কোলের শিশুটাকে ফেলে যেতে সে রাজি নয়। শিশু বুকে নিয়ে ভিক্ষে করা সাজে, ব্যবসা করা সাজে না।

অকপট পাপ দেখেছ জানি, কিন্তু এমন অকপট দারিদ্র্য দেখেছ কোনো দিন?

আরেকটি মার কথা শোনো। নাম এর নবীনকালী।

আমাদের আসতে দেখেই ভাবলো ওর জন্যে নিশ্চয়ই খাবার নিয়ে এসেছি।

'থুঃ থুঃ, কিছু খাবনা আমি। ভেবেছ, আমি হাত পেতে ভিক্ষে করে খাই? কখনো না, আমি কালী, নবীনকালী, আমি কেড়ে-কেড়ে খাই, চিবিয়ে-চিবিয়ে খাই। এখন কাড়বারও নেই, খাবারো নেই।'

'বেশ তো, কেড়ে খাও না আমাদের থেকে।' বললেন আমার সহকর্মী।

'তোমাদের সঙ্গে আমি পারবো কেন?'

'তবে কার সঙ্গে পারবে?'

'পারবো সব দুখের ছেলেদের সঙ্গে।'

'তারা কোথায়?'

'যদ্দিন ছিল, হাত থেকে কেড়ে-কেড়ে খেয়েছি। কোনো একটা খাবারের টুকরো পেয়েছে হয়তো ভিক্ষে করে, সাধ করে দেখাতে এসেছে আমাকে, অমনি আমি তো কেড়ে নিয়ে মুখে পুরেছি। আমি যে কালী, নবীনকালী, আমার যে বেশি খিদে।'

'সেই সব ছেলেরা গেল কোথায়?'

'বা, তাদের চিবিয়ে-চিবিয়ে সাবাড় করে দিয়েছি না? ওরা নেই বলেই তো আজকে আমি অনাহারে। আজকে আমার কাড়বারো নেই, তাই খাবারো নেই।'

অনেক দুর্ভিক্ষের ইতিহাস তুমি পড়েছ, চীনের, রাশিয়ার, একবার স্বচক্ষে

এসে দেখে যাও না তোমার সোনার বাঙলার ভস্মশেষ। হালে তুমিও নিশ্চয় ইজিচেয়ারে শুয়ে শৌখিন সব স্বপ্ন দেখছ, যেহেতু অনেক আকাঙ্ক্ষার পিছনে ছুটে-ছুটে তোমার ঘোড়াও গাধা হয়ে গেছে, কিন্তু এখানে এসে দয়া করে একবার অস্বীকার করে যাও তোমার সম্ভ্রান্ত দূরত্বকে, নিষ্ক্রিয় ভাবালুতাকে। আসবে একবার? তার পর পারবে তো হাসতে?

যে আসে না আর যে পালায় দুইই সমান অপরাধী।

আর যাই করো, তলোয়ার দিয়ে কুটনো কুটো না। যা সত্যিকারের বড় জিনিস তাকে অপরিচ্ছন্ন করে দেখিয়ো না আর তোমাদের কর্মহীনতার দর্পণে।

আরো একটি মা দেখলুম, ফিরছে গ্রামের পথ ধরে।

'কোত্থেকে আসছ?'

'হাট থেকে, আতাপুরের হাট।'

'সেখানে কী? কিছু কিনতে গিয়েছিলে?'

'আর কিনেছি!'

'তবে বেচতে?'

'যা বেচবার ছিল, কবেই দিয়েছি বেচে।'

'তবে?'

'এমনি দেখতে গিয়েছিলাম হাট।'

'কি? সওদা পসার?'

'না। দেখতে গিয়েছিলাম আমার পরীজান আসে কিনা।' মার চোখের দৃষ্টি কান্নায় কালো হয়ে উঠলো।

বুঝতে দেরি হলো না, বললুম, 'ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেছে বুঝি?'

'পাঁচ বছরের মেয়ে—ঘর ছাড়বার সে জানে কী! তাকে আমিই ঘর থেকে বের করে দিয়েছি।'

'বের করে দিয়েছ!'

'হ্যাঁ, বেচে দিয়েছি ঐ আতাপুরের হাটে। মাত্র পাঁচ সিকে পয়সায়। চাষীরা এঁশে-রোগা গরু বেচে, আর আমি আবাগী, মেয়ে বেচি।' বলে সে প্রায় গা ঘেঁসে এসে দাঁড়ায়, বলে, 'আচ্ছা সাহেব, ঐ বিক্রী কি আইন মানবে, পারে মানতে ? দলিল নেই, রসিদ নেই, মেয়ে অমনি নিয়ে গেলেই হলো ? হাটের মাঝে আমাকে দেখতে পেয়ে ও যদি মা বলে ফের জড়িয়ে ধরে আমাকে, তাহলেও কি আমার স্বত্ব ফিরে আসবে না বলতে চাও ?'

'নিশ্চয় আসবে।'

'ঠিক বলেছ, তা কখনো হয়! খাওয়াও পরাও, আর যাই করো, মা বলে ডাকবে শুধু আমাকে, কাঁদবে শুধু আমারই কথা ভেবে। তাই তো হাটের দিনে হাটে যাই, যদি কানে ভেসে আসে তার সেই পুরোনো কান্নার সুর। আচ্ছা সাহেব,' সে আবার ঘনতর হয়ে ওঠে, 'তুমি তো কত দেশ ঘুরবে, দেখো তো কোথাও আমার পরীজানকে দেখ কিনা। যদি দেখো তো, বোলো যে তার মা এখনো রবি-মঙ্গলবারে তার জন্যে বসে আছে সেই আতাপুরের হাটে।'

একবার এসো না এই মৃতদেহ আর মরা ঘাসের দেশে। দেখেছ অনেক উদ্ধত ঐশ্বর্য, এবার দেখ এসে উদ্ধত দরিদ্রতা।

কাজ কিছুই শুরু হলো না এখনো। সহকর্মী নিয়ে এলেন ক'টা রুগী তাড়িয়ে।

দুঃখের বাটালি দিয়ে কাটা, ক্ষুধার রেঁদা দিয়ে ঘসা। মাংস নেই, রক্তের স্পন্দন নেই। শিরাময় শরীর।

নাম বললে অভয় হাওলী।

বললে, পেট ফাঁপা, কানের মধ্যে ফটফট করে।

গায়ে হাত দিয়ে দেখি প্রবল জ্বর। থার্মোমিটার লাগাই, প্রায় একশো তিন ডিগ্রি।

'তোর যে ভীষণ জ্বর—'

'ও কিছু নয়, সাহেব।' অভয় নির্ভয়ে হাসে। 'ও আমাদের গা-সওয়া। কখন আসে কখন যায় টেরই পাইনে। যতো রাজ্যের ব্যামো এসে জুটেছে পেটের মধ্যে। পেটের ভিতর থেকে খানিকটা কেটে বাদ দিয়ে দিলে যেন একটু দম নিতে পারি। ফুসমন্তরে উড়িয়ে দিতে পারো না এই পেটের ভার? জ্বর, জ্বরের কে তোয়াক্কা করে! ও তো জল-ভাত। যদিও এখন জলও নেই ভাতও নেই।' আবার হাসে অভয়।

আরেকজন কে এলো, যেন জীবনটাকে শুষে নিয়ে ছিবড়ে ফেলে রেখে গিয়েছে এমনি মুখ। নাম বললে, দুঃখীরাম আহির। মতিহারি না মনিহারিতে বাড়ি, ভাসতে-ভাসতে চলে এসেছিলো বাঙলাদেশ, বাপের সঙ্গে। নৌকো বাইতো নদীতে। প্রথমে গেল নৌকো, পরে গেল বাপ, ক্রমে ক্রমে ছেলে-মেয়ে, পরিবার। সব শেষে গেছে তার স্বাস্থ্য—সে নিজে নয়, তার জীবিকার্জনের শক্তি। তার প্রতিরোধের ক্ষমতা।

'এখন করো কি?'

'দাওয়ালের কাজের জন্যে জন খাটতে ডাকছিলো কাছারির বাবুরা, কিন্তু হাত দিয়ে দুগ্রাস ভাত তুলতে পারি না মুখে, তা কাস্তে দিয়ে আমি ধান কাটবো! মাঠ-ভরা ধান অথচ কাটবার লোক নেই, জনের দাম চার টাকা দিন, কে ভাবতে পেরেছিলো কবে।' দুঃখীরাম একটা শ্বাস ফেললে, বুকের পাঁজরগুলো উই-ধরা চটার বেড়ার মতো ঝরঝর করে উঠলো।

কী না-জানি অসুখ, নিজেই শঙ্কিত হচ্ছিলুম মনে-মনে।

'অসুখের জন্যে আসিনি সাহেব তোমার কাছে। এসেছি যদি উপকার করতে পারো একটা।'

'কী?'

'কবে কোন কালে সামনের দুটো দাঁতে ছ্যাঁদা করে সোনা পুরেছিলাম, দয়া করে সেই দুদানা সোনা যদি এখন বের করে দাও। শুনেছি অনেক দাম নাকি সোনার—যদি পাই এখন একটু ছিটেফোঁটা—'

বলে দুঃখীরাম তার দাঁতগুলি মেলে ধরলো।

তোমার দাঁতও আমি নিশ্চয়ই বহুবার দেখে থাকবো, যখন তুমি হেসে উঠেছ নিরর্গল। তোমার সে হাসি মনে পড়লেও দাঁত মনে পড়ছে না। যদি বা চেষ্টা করি ভাবতে, দেখি কেবল দুঃখীরামের সেই দাঁত, কীটদষ্ট অথচ স্বর্ণখচিত।

এক ঝাঁক কালো পাখির মতো রাত উড়ে এলো। সঙ্গী বললেন, 'ফিরে যাই।'

বললুম, 'কী বলো! দেখি একবার রাতের চেহারাটা।'

'কিন্তু থাকবে কোথায় এখানে?'

'খোলা আকাশের নিচে, খড়ের গাদায়, যেখানে-সেখানে। আমার জন্যে তোমার ভাবতে হবে না।'

'তবে আমি থাকি গিয়ে মুরুব্বির বাড়িতে। তোমার খাবারটা—'

চোখাচোখি হতেই সঙ্গী হাসলেন নিঃশব্দে। সন্ধে হতে-না হতেই খাওয়ার চিন্তা করছি, নিজেদেরই কেমন অস্বস্তি লাগছিলো।

কাঁচা চামড়ার গন্ধে বাতাসটা ভারি হয়ে উঠলো। গাড়ি বোঝাই হয়ে গরুর চামড়া চলেছে। ভারের চাপে ঘাড় ছিঁড়ে পড়ছে গাড়ির গরু দুটোর, চোখে স্তব্ধ হয়ে আছে ভয়, নিজেদের পরিণতির গন্ধ পেয়ে।

ক্ষুধায় দম বন্ধ হয়ে আসছে, শীতে ফোস্কা পড়েছে সমস্ত গায়ে এমনি চেহারায় গাড়োয়ান, ছাতেম গাজী, বললে আমাদের প্রশ্নের উত্তরে, 'শুধু মানুষই নয় সাহেব, গরুও একধার থেকে সাবাড় হয়ে যাচ্ছে। দেখা দিয়েছে পশ্চিমে রোগ, জ্বর হচ্ছে আর মাঝে-মাঝে কাঁপছে, প্রথমে এক পা খোঁড়া হচ্ছে, ক্রমে-ক্রমে আর সব পা। যাকে বলে খোঁড়-পশ্চিমে, ও-ব্যাধি আর সারে না। তারপর মটরের মতো ডুমো-ডুমোও বেরুচ্ছে অনেকের গায়ে।'

চাঁদ উঠে এসেছে আকাশে, জাঁকালো চাঁদ, জ্বলছে যেন মুক্তির মতো।

অন্তত তোমার কলকাতার আকাশে চাঁদকে তাই মনে হবে হয়তো, কৃষ্ণীকৃত আকাশে। কিন্তু এখানে, আমার পাশে যদি তুমি আজ থাকতে, তবে চাঁদকে তোমার নিশ্চয়ই মনে হতো, চীরবাসা কোনো ভিক্ষুকের মেয়ে, গৃহহীন।

মেঘের আভাস আছে আকাশে, থেকে-থেকে জ্বলছে কয়েকটা তারা। কার মতো বলবো? বিয়ের হীরের আংটির মতো, না, গরুর গায়ে উঠেছে যে ঐ ডুমো-ডুমো মটর-দানা, তার মতো?

মেঘ কালো হয়ে এসে সবুজ ক'টা বিদ্যুৎ চমকালো। লিকলিকে বেতের বাড়ির মতো বইতে লাগলো শীতের হাওয়া। এখুনি বিস্মৃতির মতো নেমে আসবে হয়তো বর্ষণ।

মালপত্র নিয়ে সহকর্মী কখন চলে গেছেন মুরুব্বির বাড়ি, আমি কোথাও একটা আস্ত আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছি না। চাল আছে তো বেড়া নেই, বেড়া আছে তো চাল রয়েছে মুখ থুবড়ে; চাল আর বেড়াও যদি-বা আছে লোক নেই, উজাড় উচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

ধারালো ধারায় বৃষ্টি নেমে আসতেই হাতের কাছে যা পেলুম উঠে পড়লুম সেই চালাঘরে। যেমন অন্ধকার, নিশ্চয়ই পোড়ো বাড়ি। কিন্তু হঠাৎ জীবিত লোকের নিশ্বাস শুনতে পেলুম। সে প্রাণের স্পর্শ যে কী আরামের তা বলবার নয়।

টিপলুম হাতের জোরালো টর্চ। দেখলুম, পিছনে, অনাবৃত ঘরের মধ্যে একটি মেয়ে আছে বসে, আর তার পাশে ছেঁড়া কাঁথায় আগাগোড়া গা ঢেকে শুয়ে আছে ওর স্বামী। শীত পেয়ে নিজে বেশ আরামে কাঁথামুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে আর এদিকে স্ত্রীর পরনের ন্যাকড়াটা কোমরের কাছেই সীমাবদ্ধ, স্বার্থপরতার এ দৃশ্যটা যেন চোখের উপর সইতে পারছিলুম না।

এগিয়ে এসে বললুম মেয়েটাকে, 'কম্বল নেবে?'

নিস্পৃহভাবে সে বললে, 'কোথায়?'

কাঁধের উপর ছিল একটা বৃষ্টির জন্যে। দেখিয়ে বললুম, 'এই যে।'
'একটাই তো মোটে। আমরা তো দু'জন।'
দেখ, মেয়েটার কী পরার্থপরতা!
মেয়েটার শরীরে যা লক্ষণ তাতে ঐ নিদ্রিত লোকটা ওর স্বামী ছাড়া আর কেউ নয়। তাই বললুম, 'কেন, এক কম্বলের নিচে শোবে দু'জনে।'
একদিন আমরা তাই কল্পনা করতুম, না? ভাবতুম, কী যায় আসে, যদি উত্তাল সমুদ্রে ঝড়ের রাতে ডুবন্ত জাহাজের খোলা ডেকের উপর এক কম্বলের নিচে শুয়ে থাকতে পারি দু'জনে।
'দরকার নেই, ও কম্বল তুমি আমার বাপকে দিয়ে দাও।' মেয়েটা ঘুমন্ত লোকটার দিকে একটা উদাসীন ভঙ্গি করলো।
বাপ! যেন একটা চড় খেলুম। বললুম, 'তোমার বিয়ে হয়নি?'
'ওমা, বিয়ে আবার কবে হতে গেল!'
'বিয়ে হয়নি, তবে তোমার এ দশা—'
'কী দশা আবার! পরনে কাপড় নেই, তাই অমন বসে আছি ভূতের মতো।'
খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জানলুম তার ইতিহাস। নাম বিনোদা, বয়েস তেরো-চোদ্দ। বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, সত্যিই জানে না সে কিছু। তখনো জানেনি, এখনো জানে না। কোনোই বোধ নেই, স্বাদ নেই, ইচ্ছা নেই। ঋজু বিশ্বাস তার বাপ—বাপ ছাড়া সে কিছুই জানে না এ সংসারে। নিজের খাবারের কথা সে ভাবেনি, ভেবেছে বাবার ওষুধের কথা। সবাই বলে, কুইনিন পেলেই নাকি চাঙ্গা হতে পারে আবার তার বাবা। বলে আড়াই আনি মালেকের ডিহি-নায়েবের ছোট মুহুরিবাবু। বলে, 'দেবো, চুপি চুপি আসিস রাত করে।' কোনো দিন পয়সা বা দেয়, কোনো দিন পয়সা বা দেয় না। বাবা বলে, 'ও কটা সামান্য পয়সা নিয়ে আমার জন্যে ওষুধ কিনতে হবে না, দু'টি চাল কিনে এনে ফুটিয়ে খা গে যা। আমার

অসুখ এমনিতেই সেরে যাবে।' সত্যি, প্রায় পাঁচ-ছ' মাস পরে এই আজই প্রথম বাবার জ্বরটা একটু কম পড়েছে।

ম্যালেরিয়া যখন, হু-হু শব্দে ফের চলে আসতে কতক্ষণ! কিছুটা কুইনিন এখুনি ঠুসে দেয়া যাক ঝড়ুকে।

আকাশ পরিষ্কার হয়ে চাঁদ ফের গা ধুয়ে এসে দেখা দিলেও টেপা টর্চকে নিবতে দিলুম না। ঝড়ুর মুখ থেকে তুলে ফেললুম ঐ কাঁথার ন্যাতাটা। ডাকতে গেলুম, ঝড়ু।

তোমার ঘরে কত রাতে তোমার মুখের উপর চাঁদের আলো পড়তে দেখেছি। মরা মুখের উপর চাঁদের আলো পড়তে এ প্রথম দেখলুম।

মুখটা তার বেঁকে ঝুলে রয়েছে, আর বেরিয়ে রয়েছে সব ক'টা দাঁত। শক্ত, মৃত দাঁত। সেই দাঁতের উপরে জ্যোৎস্না। বাইরে এসে দেখি গৃহহীন চাঁদ একা-একা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সত্যি, বোধ নেই, স্বাদ নেই, ইচ্ছে নেই, ললিতা।

তুমি আমাকে ক্ষমা করবে, যখন এর পর পরের ছত্রে আমি লিখবো প্রেম একটা প্রহসন। অবান্তর য়্যাপেনডিক্সের মতো। কত দুর্বল বাহু, আর কত দুর্বার ভার আমাদের সামনে। সে-ভার না-সরাবার চেষ্টা করে পলাতকের মতো তোমার ঘরে গিয়ে সে-বাহু দিয়ে তোমার কণ্ঠমাল্য রচনা করবো এ একটা ধিক্কারের মতো আমার বুকের হাড়ের মধ্যে এসে বাজছে। কত তুচ্ছ আমাদের প্রেম এই মৃত্যু এই পাপ এই অসহায়তার কাছে। কত বড় ব্যঙ্গ এই শস্যময় শ্মশানের উপর।

আমি আর ফিরবো না। আমার অনেক কাজ।





ম্যাজিক



রাসেশ্বরী বেরিয়ে আসতেই সদাশিব বাথরুমে ঢুকলো। এবং বাথরুম থেকে বেরিয়েই সরাসরি রাসেশ্বরীর কাছে এসে উপস্থিত।

'এই নাও, টাকা নাও একটা। হাত পাতো।'

রাসেশ্বরী তখন নতুন করে চুল ঝাড়ছে। হেলা কোমর সোজা করে সে দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল করে সদাশিবের দিকে চেয়ে রইলো। টাকা কেন? সে কী কথা!

'এটা কী? টাকা তো?' সদাশিব তার চোখের সামনে একটা চকচকে টাকা নাচাতে লাগলো। 'তবে নিচ্ছ না কেন? নাও, টাকার অমান্য করতে নেই, এলেই হাত পেতে নিতে হয় তক্ষুনি। হাত পাতো বলছি।'

রাসেশ্বরী তবু দ্বিধা করছিলো। সদ্য-সদ্য বাড়ি ফিরেই সদাশিব তাকে এ-টাকাটা কেন দিচ্ছে, কিসের বাবদ, সে বুঝতে পাচ্ছিলো না কিছুতেই।

'হাত পেতে নে না টাকাটা। বলছে এত করে!' ও-পার থেকে বিছানায়-শোয়া অনুপমা বলে উঠলো, দুর্বল, নির্বাপিত কণ্ঠে।

কিছুটা সাহস পেলো রাসেশ্বরী। তবু হাত বাড়িয়ে, অকারণে, পুরুষের হাত থেকে টাকা নিতে কেমন লজ্জা করে।

'দিন যখন দেবেন।' ঠোঁট টিপে হেসে রাসেশ্বরী হাত পাতলো।

বেশ মজবুত হাত। থাবাটা প্রকাণ্ড। আঙুলগুলো মোটা-মোটা।

'কী, এটা টাকা তো ঠিক? ঠিক বাজছে শুনছ?' দু আঙুলে রেখে সদাশিব টাকাটা রাসেশ্বরীর চোখের সামনে শূন্যে তুলে বাজালো দুবার। বললে, 'এইবার নাও, ধরো।' বলে টাকা-শুদ্ধ তার হাতটা সে রাসেশ্বরীর প্রসারিত করতলের উপর উপুড় করে ধরলো। একটু-বা ত্রস্ত, ত্বরিত গলায় বললে, 'শক্ত করে মুঠ করে ধরো টাকাটা! বড়ো পাজি জিনিস, আঁকড়ে আঁট করে ধরে থাকতে হয়।'

রাসেশ্বরী হতভম্বের মতো হাত মুঠো করলে।

'এবার দাও আমার টাকা ফিরিয়ে।' বললে সদাশিব, একটু-বা যেন তাগাদার স্বরে।

'এ আবার কোন ঢঙ্। কে চেয়েছিলো আপনার টাকা?' হাতটা ঈষৎ লম্বা করে সদাশিবের দিকে ছুঁড়ে দিল রাসেশ্বরী। কিন্তু কী সর্বনাশ, তার মুঠোর মধ্যে সেই টাকা নেই, গোল-গোল ছোট-ছোট দুটি সোনার বিন্দু, তারই কান-ফুল।

'ও -মা, বাথরুমে ফেলে এসেছিলুম বুঝি!' বাঁ হাত দিয়ে রাসেশ্বরী কর্ণমূলদুটি অনুভব করলে। চার দিকে ত্রস্ত চোখ বুলিয়ে বললে, 'কী আশ্চর্য, এ আমার হাতের মধ্যে চলে এলো কি-করে? টাকাটাই বা গেল কোথায়? আপনি নিয়ে গিয়েছেন বুঝি?'

'ছেলে-ভুলুলে চলবে না।' সদাশিব গম্ভীর গলায় বললে, 'আমার টাকা তুমি ফিরিয়ে দাও।'

দিদির মুখে দুষ্টু-দুষ্টু হাসি দেখে রাসেশ্বরী কিছুটা আশ্বস্ত হলো। বললে, 'সব আপনার চালাকি। আমি বুঝি বুঝিনা কিছুই!' বলে সে একটা ঘনকৃষ্ণ কটাক্ষ করলো।

আর যাই হোক, তার এই ভঙ্গিটাও বিশেষ বোধগম্য নয়। তাই অনুপমা বললে, 'ম্যাজিক লো ম্যাজিক। ভোজবাজি।'

ভর-দুপুর, খেয়ে-দেয়ে রাসেশ্বরী অনুপমার্ পাশটিতে এসে বসেছে। দিদির কথামতো নিয়ে বসেছে সে কৃত্তিবাসী রামায়ণ, পড়ে শোনাচ্ছে লক্ষ্মণের শক্তিশেল। এমন সময় পাশের ঘর থেকে শোয়া ছেড়ে উঠে এলো সদাশিব, অনুপমার তক্তপোষের কাছেই একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লো। বললে, 'শুনি তোমার পড়া—'

রাসেশ্বরীর লজ্জা পাবার কথা, কিন্তু ভয় পেয়ে সে পাগলের মতো লাফিয়ে উঠলো আচমকা।

'কী হলো, কী হলো তোমার?' সদাশিব চিন্তিত গলায় প্রশ্ন করলে।

গায়ের এলোমেলো আঁচলের দিকে চেয়ে ভীত মুখে রাসেশ্বরী বললে, 'নেংটি ইঁদুর একটা—'

'কোথায় ?'

'তক্তপোষের তলা থেকে আমার গায়ের উপর লাফিয়ে পড়লো দেখলাম। এই যে, এই যে।' ত্রস্ত-ব্যস্ত হয়ে রাসেশ্বরী কাপড় ঝাড়তে লাগলো: 'কী সর্বনাশ! বুকের মধ্যে ঢুকে পড়লো যে।' দিদি তো রোগে অনড়, তার কাছে কিছুই সাহায্যের আশা নেই ভেবে রাসেশ্বরী সদাশিবের দিকে তাকালো একেবারে দীনহীনের মতো। কোথায় বা তার গায়ের বসন, কোথায় বা তার কটি কসন—অশাসন সর্বত্র।

'ইঁদুর—ইঁদুর এখানে আসবে কোত্থেকে ?' সদাশিব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

না, নেই, গেছে—তাই মনে হলো রাসেশ্বরীর। শেমিজের উপর পুরু করে আঁচল টেনে শান্ত ভঙ্গিতে বসতে যাবে সে বিছানায়, অমনি আবার চোখ বড়ো করে চেঁচিয়ে উঠলো: 'ঐ যে, ঐ যে আবার। দিদির গায়ের উপর।'

অনুপমার অবিশ্যি কোনো চাঞ্চল্য নেই। মুখে অতি-ম্লান একটু হাসি ছাড়া। ইঁদুরটা আবার অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিন্তু রাসেশ্বরীর স্বস্তি কোথায়! এঁটে-সেঁটে বসেও তার কেমন ভয় এই বুঝি ফের সব অগোছাল উথল-পাথল হয়ে যাবে।

'আমার বসা হবে না এ-ঘরে। ঐ—ঐ চলে গেল ফের পায়ের তলা দিয়ে।'

'না, না, বোসো। ভয় কী! ইঁদুর আমার এই হাতের উপর।' সদাশিব মেলে ধরলো তার হাতের তালু, তার উপরে বসে স্প্রিং-বসানো একটা ন্যাকড়ার ইঁদুর ফুরফুর করে ল্যাজ নাড়ছে।

'ম্যাজিক লো ম্যাজিক।' জড়ানো ক্ষীণকণ্ঠে বললে আবার অনুপমা। 'দেখছিস না ইঁদুরের পায়ের সঙ্গে সুতো বাঁধা, আর সেই সুতো রয়েছে ওর আঙুলে জড়ানো।'

ঠাহর করে দেখবার জন্যে রাসেশ্বরী ঝুঁকে এলো একটু সদাশিবের হাতের কাছে, আর অমনি সেই ইঁদুর তার পিঠের উপর লাফিয়ে পড়েই ঘরময় মাতামাতি সুরু করে দিল। রাসেশ্বরীর আর ভয় নেই, বেধড়ক হাসতে লাগলো সে শব্দ করে।

যেন নতুন কিছু শুনছে আজ সদাশিব। দেহের স্তবকে স্তবকে হাসি, শাড়ির পরলে-পরলে। ন্যাকড়ার আগুনের মতো নিবেও নিবতে চায় না।

উত্তরবঙ্গের সফর সেরে বাড়ি ফিরে এই দেখতে পেলো সে রাসেশ্বরীকে। তার আগে ছিল শুধু সে একটা শোনা-কথা। অনুপমার দূর সম্পর্কের দুঃস্থ এক বোন, স্বামী যার দশ বছর ঘরছাড়া। দেশে-গাঁয়ে মাটি আঁকড়ে পড়ে আছে, চেয়ে-চিন্তে কোনোরকমে দিন চালায়। চেহারা যেটা ভেসে উঠেছিলো চোখের সামনে সেটা নিতান্তই হাজাশুখা, গরলায়েক পতিত জমির চেহারা। এমন ভরা-ভর্তি ভাদ্রের নদী নয়।

জলের দিকে যাওয়া ঠিক হলো না, রাসেশ্বরী একেবারে দপদপে আগুনের খাপরা।

সাত মাসেরও উপর অনুপমা শোয়া। স্নানের ঘরে টলে পড়ে গিয়ে বাঁ পাশ তার অবশ হয়ে যায়। গোড়ায় কথাও জড়িয়ে গিয়েছিলো, ঠিকঠাক কিছু মনে করতেও পারতো না। আস্তে-আস্তে ঝাপসা-ঝাপসা সব আবার ফিরে এসেছে বটে, কিন্তু বাঁ দিক তার আর বশে এলো না। কেউ-কেউ বলে, কথা ও স্মৃতির যেটুকু স্ফুরণ সেটা শুধু নির্বাপিত হবার আগে প্রদীপের চতুরালি।

কুড়িগ্রাম গিয়েছিলো সদাশিব এক পুলিশ-ইনস্পেক্টরের ফেয়ার-ওয়েল পার্টিতে ম্যাজিক দেখাতে। আর কোথাও রুজি জোগাড় হয় কিনা তাই ভেবে সে এখানে ওখানে ঢুঁ মেরে বেরিয়েছে। মোটমাট বাইরে ছিল সে দিন কুড়িরও বেশি। বাড়ি থেকে চিঠি যেত বড়ো ছেলের হাতে—মা

একই প্রকার আছেন, চিন্তা করবেন না। বেবদল, একই প্রকার থাকাটাই যে জাদুকরের কাছে ঘোরতর চিন্তার কথা, ছোট ছেলে তার কী বুঝবে? বাড়ি ফিরেই এই কাণ্ড। এই রাসেশ্বরী।

একাদিক্রমে সতেরোটা ঝি ছিল এ পর্যন্ত, তিক্ত-বিরক্ত হয়ে গেছে অনুপমা। কোথাও যেন সে এমন স্পর্শটি পায় না যা নরম আর গরম একসঙ্গে। কী মনে করে কত দিনের ছাড়াছাড়ি এড়িয়ে চিঠি লেখালে সে রাসেশ্বরীকে। অশ্লেষা দিকশূল না দেখে রাসেশ্বরী এক দৌড়ে এসে হাজির হলো।

না খেতে পেয়ে আঁত মরে গিয়ে পেটের চামড়া পিঠে এসে ঠেকেছে— এমনি দেখবে ভেবেছিলো রাসেশ্বরীকে। কিন্তু রাসেশ্বরীর সর্বাঙ্গে স্বাস্থ্য যেন ধরে না। থোলো-থোলো স্বাস্থ্য নয়, ছেঁচা মজবুত চেহারা। আর কী শক্তি ধরে সে শরীরে, কাঠের উনুনের মুখে তার এক ফুঁয়েই আগুন জ্বলে ওঠে, জলে ধুয়ে কাপড় একবার নিংড়ে দিলেই শুকিয়ে যায় দেখতে-দেখতে, রোদ লাগে না। কাঁসার বাসন মাজলে রূপার হয়, পিতলের মাজলে সোনার। ঘর ঝাঁট দিলে মনে হয় যেন শ্বেতপাথরের মেঝে। অরুণোদয়ে ওঠে আর অস্ত যায় মধ্যরাত্রে। হাম-হাম করে থাবা-থাবা খায় আর গা ঢেলে দিয়ে ঘুমোয়।

আর, যখন, কখনো-সখনো পাশটিতে এসে বসে, অনুপমা তার গায়ের উমে বড়ো আরাম পায়, ভাবে, এই বুঝি সেও আবার ঢেউয়ে' উঠবে। দিয়ে উঠবে পাখার ঝাপটা।

যাক, ছেলেপিলেগুলোর তবু একটু যত্ন হচ্ছে, ঝি-মাগীদের ঠেকার আর সইতে হচ্ছে না, সাশ্রয় হচ্ছে সংসারের, নিজের অসহায়তায় অসঙ্কোচ হতে পারছে কতকটা, আর সদাশিবেরো যেন মনের গুমোট গিয়েছে কেটে।

'ধুমসো জোয়ান।' কী-একটা ভারী কাজ করছিলো রাসেশ্বরী, স্বামীকে শুনিয়ে অনুপমা বললে।

'কিন্তু দেখেছ, কেমন গড়ন-পিটন, কেমনই বা হেলন-দোলন!' সদাশিব একটু নির্লজ্জের মতো বললে।

এখন তার অনেক সাহস, ভাবলো অনুপমা। ভাবলো, সেই শুধু আউট হয়ে গেছে।

দুপুর বেলা। অনুপমাকে তরণীসেন-বধ পড়িয়ে শোনাচ্ছিলো রাসেশ্বরী, সদাশিব এলো তাসের ম্যাজিক দেখাতে।

রাসেশ্বরী তাসের ভাঁজ থেকে বেছে-বেছে চারটে বিবি বের করে নিল। সদাশিব বললে, 'উপুড় করে রেখে দাও শুইয়ে।'

পাশাপাশি রেখে দিল উপুড় করে। সদাশিব বললে, 'এবার তুলে দেখ তো, কী করছে ওরা চার বোন।'

রাসেশ্বরী তো অবাক। চারখানা তাসের মধ্যে দুটো শুধু বিবি, আর দুটো সাহেব জুটেছে কোত্থেকে।

'হতেই হবে।' হাসতে-হাসতে বললে সদাশিব, 'একা-একা ওরা থাকে কি-করে?'

রাসেশ্বরী আকুলি-ব্যাকুলি করে উঠলো: 'আমাকে শিখিয়ে দিন না। ধরলেন না, ছুঁলেন না, বিবি বদলে সাহেব হয়ে গেল—দিন, দিন না আমাকে শিখিয়ে।'

বাইরে অমনি দরজায় কড়া নড়ে উঠলো।

সেদিকে চলে যেতে-যেতে ব্যস্ত হয়ে সদাশিব বললে, 'এটা কী ছাই খেলা! দাঁড়াও, রোসো—'

দরজার কড়া নাড়ছিলো অটলবিহারী, আদালতের পেয়াদা। সদাশিবের নামে সমন নিয়ে এসেছে।

'দুই নম্বর ছোট আদালত করেছে, বাবু।'

'দুই নম্বর?' সদাশিব যেন হোঁচট খেল।

'হ্যাঁ। এক, কালী ডাক্তার; দুই, আপনার বাড়িওলা।'

'কালী ডাক্তারের বিলের টাকা শুধতে পারিনি বটে, কিন্তু তাই বলে ও নালিশ করলো?' সদাশিব চোখে ঝাপসা দেখছে।

'ওটার কথা আর বলবেন না, বাবু। ওটা হচ্ছে বোম্বাই বজ্জাত।' অটলবিহারী মুখে একটা ঘৃণার ভাব আনলো। বললে, 'কারুর খারাপ অসুখ করলে প্রথমটা খুব ধমকায়, পরে রাষ্ট্র করে বেড়ায় চারদিকে। তা, আপনি ভাববেন না, বাবু—'

'আর, ও ধরবে কী আমার অস্থাবর করে? আমার আছে কী ধরবার? আর, বাড়িওলা বুঝি আমাকে উচ্ছেদ করতে চায়?' সদাশিব একটু হাসলো: 'স্ত্রীকে নিয়ে নড়তেই যদি পারবো তবে কোন আগেই তো পালিয়ে যেতাম তোর বাড়ি ছেড়ে, ছ'মাসের ভাড়া কখনো ফেলে রাখতাম না।'

'তা, আমাকে কিছু দিন, গরজারি করে দি সমন দুটো।' অটলবিহারী অভয় দিল।

'কত?'

'সমন-গরজারিতে আমাদের আট আনা করে। মোকদ্দমার দাবি যখন কম। একশো টাকার নিচে। একটা তেতাল্লিশ, আরেকটা বাহাত্তর। একশো টাকার উপরে হলে অবিশ্যি—'

'টাকা পাবো কোথায়? এক টাকায় আমার পাঁচ-ছ দিন বাজার হবে।'

'কী যে বলেন আপনি বাবু।' অটলবিহারী উপেক্ষার হাসি হাসলো: 'ম্যাজিক দেখিয়ে তো আপনার ভালো রোজগার। এই তো রংপুর-দিনাজপুর ঘুরে এলেন।'

'কষ্টে-সৃষ্টে ট্রেনভাড়াটা শুধু উঠেছে। পয়সা খরচ করে কেউ দেখতে চায় না, তাই পেট চলবে কি-করে বলো? জজ-ম্যাজিস্ট্রেটদের সার্টিফিকেট কতগুলো জোগাড় হয়েছে শুধু।'

অটলবিহারী হাসলো। বললে, 'এ যে প্রায় আশু আচার্যির দশা আপনার। নালিশ-ফসাদ করে জমি-জায়দাদ সব খুইয়েছে ও—প্রায় বিশ হাজার টাকার সম্পত্তি। এখন সম্বল শুধু তার কয়েকখানি কাগজ—আদালতের রায়ের নকল। তাই পুঁটলি করে বেঁধে বগলে চেপে কোর্টের বারান্দায় সে ঘুরে বেড়ায়।'

'আর কীই বা দেখাবো বলো ম্যাজিক? সব পুরোনো, একঘেয়ে হয়ে গেছে। নিত্যি-নিত্যি নতুন রকম ম্যাজিক চাই, যা ভাবেনি কেউ, দেখেনি কেউ। নতুন-নতুন ম্যাজিকে নতুন-নতুন সরঞ্জাম লাগে, লাগে পয়সা। জোগাড় করতে পারি না।'

অটলবিহারী নরম হলো খানিকটা। বললে, 'আচ্ছা, চার আনা করেই দিন তবে। কালী ডাক্তার এক চক্কর ঘুরুক।'

'দরকার নেই। হাজির-জারিই হোক। দাও সমন, সই করে দি।' সদাশিব হাত বাড়ালো: 'নতুন কিছু একটা ঘটুক আমার অদৃষ্টে। ঘর থেকে গাছতলায় এসে দাঁড়ানো—তাই বা কম ম্যাজিক কি! মাথার উপরে এই ছাদ আছে, আর এই সেটা আকাশ হয়ে গেল দেখতে-দেখতে।'

সমন নিয়ে সদাশিব ভিতরে এলো। রাসেশ্বরী ঘরে নেই, ভিতরের দাওয়ায় বসে দিদির জন্যে শিলে অনুপান ছেঁচছে। অনুপমা যে-কে-সে শোয়া, চেয়ে আছে অথচ লক্ষ্য নেই; চোখের মধ্যে কালোর চেয়ে শাদার ভাবটাই বেশি।

কিছুটা আঁচ করতে পেরেছে অনুপমা। মোটা গলায় জিগগেস করলে, 'কি, নালিশ করেছে বুঝি বাড়িওলা?'

'শুধু বাড়িওলা নয়, কালী ডাক্তারও।' বিতিকিচ্ছি করে লেখা আর্জির নকলটা দেখতে লাগলো সদাশিব।

'তুমি যখন বাড়ি ছিলে না, একদিন এসে খুব গলাবাজি করে গেছে বাড়িওলা। কিন্তু ডাক্তার—কালী ডাক্তার নালিশ করলো?'

'ভালো করতে পারলো না যখন, তখন নালিশই তো করবে। নিজের অক্ষমতার জন্যে লজ্জা নেই, উলটে আস্ফালন আছে।' হাতের কাগজ-গুলোকে দলা পাকাতে লাগলো সদাশিব।

'এদিকে কয়েক দিন আগে গঙ্গা-মুদি শাসিয়ে গেছে, উঠনো আর দেবে না আসছে-মাস থেকে। কী হবে বলো দেখি?' অনুপমার গাল বেয়ে জলের ধারা নেমে এলো।

'কিছু একটা হবেই।' বললে বটে সদাশিব, কিন্তু চারদিকে তার ধূমমাত্র আভাস খুঁজে পেলো না।

দিদিকে ওষুধ খাওয়াতে এসেছিলো রাসেশ্বরী, শেষের কথাটা শুনতে পেয়ে বললে, 'কী হবে? আপনার খেলা? কবে?'

সদাশিব জবাব দিল না। কেমন সহ্য হচ্ছিলো না রাসেশ্বরীকে।

তারপর রাসেশ্বরী যখন ঘাটে গেল জল আনতে, কাঁকালে কলসী নিয়ে, তার যতিপাতহীন পদপাতের দিকে সদাশিব একবার চেয়েও দেখলো না।

রাসেশ্বরী শুধু দিদির গা ঘেঁষেই বসেনি, বসেছে একেবারে তার হৃদয়ের মধ্যে। কোনো খবরই তার আর জানতে বাকি নেই, সংসারের কোনো আনাচ-কানাচই নেই আর তার অদেখা। রেলে আগে কাজ করতো সদাশিব, মাইনে যদিও কম আয় ছিল বাঁধাবাঁধি, উপরি ছিল এ-দিক ও-দিক, বছর আষ্টেক হলো ছাঁটে কাটা পড়লো সে-চাকরিটা। মফস্বলে খরচ কম, এখানেই থেকে গেল বরাবর। ছেলেবেলা থেকেই সখ ছিল ম্যাজিকের, মেতে উঠলো তাই নিয়ে। আগে ছিল সখের, পরে হলো পেশাদার।

'চাকরির তবিলে জমা ছিল না কিছু?' জিগগেস করলে রাসেশ্বরী।

'খেয়ে কবে ফুরিয়ে গেছে। তারপর আমি এই পড়ে।' অনুপমা শূন্য-শুভ্র চোখে রাসেশ্বরীর মুখের দিকে চেয়ে রইলো। ঝাপসা গলায় বললে,

'গায়ের গয়না কখানা তো কবেই গেছে, এখন চলছে ওঁর মেডেলগুলো বেচে।'

রাসেশ্বরী অনুপমার পঙ্গু অঙ্গে হাত বুলুতে-বুলুতে বললে, 'তুমি ভেবোনা, দিদি। একটা কিছু হবেই।'

এ পর্যন্ত কিছুই তো হতে দেখলো না অনুপমা। দিনের পর দিন সেই একই রকম চেহারায় দিন আসে। একই রকম চেহারায় অন্ধকার হয়।

হঠাৎ কেমন যেন মিইয়ে গিয়েছে সদাশিব। রাসেশ্বরী তার কাছে এসে হাসি-হাসি মুখে বললে, 'মোকদ্দমার কথা ভাবছেন বুঝি?'

'মোকদ্দমা?' সদাশিব থতমত খেল। বললে, 'কে বললে তোমাকে?'

'আমি জানি। আপনার সংস্পর্শে এসে ম্যাজিক আমিও একটু-একটু শিখেছি।' রাসেশ্বরী তরল চোখে হাসলো।

সদাশিব কিন্তু একটুও উৎসাহিত বোধ করলো না।

'কিন্তু আপনি যে ভাবছেন কেন আমি তা ভেবে পাচ্ছি না। আপনার কাছে ব্রহ্মাস্ত্রই তো আছে।'

'ব্রহ্মাস্ত্র?' সদাশিব সচকিত হয়ে রাসেশ্বরীর স্থিরপলক চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো: 'কী সেটা?'

'আহা, কেন, আপনার ম্যাজিক!' রাসেশ্বরী তার ভঙ্গি আরো গম্ভীর করলো। বললে, 'খোলা টুপির মধ্যে ডিম নিয়ে আসেন একরাশ, খালি পকেট থেকে রুমাল ওড়ান শয়ে-শয়ে, শূন্য থেকে পুষ্পবৃষ্টি করান অনবরত —আর ডাক্তারের সামান্য বিল আর বাড়িভাড়ার ক'টা টাকা আপনি হাত-সাফাই করে শোধ করে দিতে পারেন না? কিসের তবে আপনার ম্যাজিক যদি এটুকু কেরামতি তার না থাকে?'

সদাশিব একদৃষ্টে রাসেশ্বরীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। একটুও মনে হলো না সে ঠাট্টা করছে।

'একবার স্টেজের উপর টাকার বৃষ্টি করেছিলাম!' একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে রেখে বললে সদাশিব।

'তবে?' রাসেশ্বরী চল্‌কে উঠল। 'একবার দেখিয়ে দিন না সেই খেলাটা। ডিম থেকে মুরগী বের করে দেন চোখের সামনে, একটা শাদা কাগজ নিয়ে দশ টাকার একখানা নোট বানিয়ে ফেলুন না এক্ষুনি। কিসের ভাবনা আপনার? আমি যদি ম্যাজিক জানতুম তো দেখতেন আমার ঘরে ভূতে টাকা বয়ে আনতো।'

সদাশিবের বুকের ভিতরটা যেন উথলে উঠলো। বললে, 'শিখবে তুমি ম্যাজিক?'

'বলছি তো কবে থেকে। দিন না শিখিয়ে।'

'শিখে তুমি করবে কী?'

'দেখুন না কী করি। ভানুমতীর খেলা—অসাধ্যসাধন করবো।' রাসেশ্বরী উচ্ছল হয়ে চলে গেল।

চমৎকার হয়, যদি ম্যাজিক শেখে রাসেশ্বরী। সদাশিব প্রায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। স্টেজের উপর রাসেশ্বরী আর সে। কত রকম অদ্ভুত-অদ্ভুত খেলা সে বের করে ফেলবে তখন। রাসেশ্বরী ম্যাজিক দেখাচ্ছে তার সঙ্গে, সর্বাগ্রে এটাই তো নতুন খেলা, প্রধান আকর্ষণ। ভ্রাম্যমাণ কোনো সার্কাস-পার্টিতে পাকা-পোক্ত ভাবে ঢুকে পড়বে না-হয়। মেয়ে-মহলে রাসেশ্বরী একলা খেলা দেখাতে পারবে। একান্ত করে মেয়েদের উপভোগ্য কত নতুন খেলা তার ভাবা আছে যা শুধু মেয়েই পারে দেখাতে। নতুন ঢঙে বক্তৃতা লিখে রাসেশ্বরীকে দিয়ে মুখস্থ করিয়ে নেবে আস্তে-আস্তে। আগে বাঙলা পরে ইংরিজি। ব্যায়াম আর উপোস করিয়ে শরীরটাকে একটু ঝরিয়ে নিতে হবে, সুষমার সঙ্গে আনতে হবে একটু সৌষ্ঠব। আর, চামড়ার উপরে ফুটিয়ে তুলতে হবে চেকনাই।

আর তবে ভাবনা কোথায়? সিন্দুকে করে ভূতে টাকা বয়ে আনবে।

সদাশিবের বুকের থেকে শক্তিশেল খসে পড়লো। সে হালকা পায়ে পাইচারি করতে লাগলো ঘরের মধ্যে।

কতক্ষণ পরে আঁচলে হাত মুছতে-মুছতে রাসেশ্বরী আবার হাজির। বললে, 'ম্যাজিক শিখে কী করবো জিগগেস করছিলেন না?'

'হ্যাঁ। কী করবে?'

স্থির চোখে চেয়ে থেকে রাসেশ্বরী বললে, 'যে লোক চলে যায় তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবো।'

'সে আবার কী কথা!' সদাশিব স্তম্ভিত হয়ে গেল।

'কেন, আপনার জানা নেই সেই ম্যাজিক? যাতে চলে-যাওয়া লোককে ফিরিয়ে আনা যায়?'

আশ্চর্য, রাসেশ্বরীর এতটুকু তরলতা নেই। কাঠিন্য, গাম্ভীর্য, স্পষ্টতা।

অশ্বাসভরা গলায় সদাশিব বললে, 'আনা যায় বৈ কি।'

এবার লজ্জা এসে ছেয়ে ফেললো রাসেশ্বরীকে। মুখের কাছে বুকের আঁচল রাশীভূত করে সে ছুটে পালালো।

তবে কি রাসেশ্বরীর টাকার দুঃখ নয়? সদাশিব তার আগের জায়গায় এসে বসলো।

দুপুরবেলা পাতাল-প্রবেশ শুনতে-শুনতেই অনুপমা আচ্ছন্ন হয়ে এলো। আগে ছিল অর্ধেক এখন সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত।

প্রথমটা রাসেশ্বরী হৈ-চৈ করলো না। অনুপমার ছোট যে মেয়েটা ঘুমুচ্ছিলো মাদুরের উপর সেটাকে বুকে করে পাশের বাড়ির জিম্মায় রেখে এলো। পাশের বাড়ির সমবয়সী ছেলেকে দিয়ে অনুপমার মাঝের ছেলেটাকে পেয়ারা খাওয়ানোর নেমন্তন্ন করালে, অর্থাৎ স্থানান্তরিত করলে। বড়ো ছেলেকে ইস্কুলে খবর পাঠালে দৌড়ে চলে আসবার জন্যে। আর, ডাকাতে হয়, ডাকালে কবিরাজকে।

এতক্ষণ পাশের ঘরে নির্ভাবনায় ঘুমুচ্ছিলো সদাশিব। হঠাৎ তার উপর যেন একটা বাঘ পড়লো লাফিয়ে: 'উঠুন, উঠুন, শিগগির—'

সদাশিব চোখ চেয়ে দেখলো রাসেশ্বরী। এলোথেলো চুল, আঁচল স্রস্ত-বিস্রস্ত, ঘরের আগুনের থেকে যেন তাকে টেনে নিতে এসেছে সমুদ্রের ঢেউয়ের উপর। তক্ষুনি উঠে পড়বে না ব্যাপারটা একটু বুঝে নেবে ভাবতে চাইলো সদাশিব।

কিন্তু রাসেশ্বরী তাকে সময় দিল না। তার হাত ধরে হেঁচকা টান মেরে সোজা তাকে তুলে ফেললো বিছানা থেকে, টানতে-টানতে সোজা তাকে নিয়ে এলো অনুপমার কাছে, বললে, 'দেখান, দেখান এবার আপনার ম্যাজিক। দিদিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন।'

'এ কি, নেই?' সদাশিব গুঙিয়ে উঠলো।

'কাঁদলে চলবে না। আপনার ম্যাজিক দেখান বলছি, আপনার শেষ খেলা। টবের মরা গাছে ফুল ফোটান আপনি, দিদির দেহেও তেমনি প্রাণ নিয়ে আসুন।' রাসেশ্বরী সদাশিবের বাহু ধরে প্রবল ঝাঁকুনি দিল।

এ একরকমের শোকোচ্ছ্বাস, সদাশিব মনে করলো। বললে, 'দাঁড়াও, একজন ডাক্তার নিয়ে আসি।'

রাসেশ্বরী দুয়ার আটকালো। বললে, 'আমাকে ন্যাকা বোঝাতে হবে না। ম্যাজিকের কাছে ডাক্তার কিসের! গলা কেটে ফেলে জোড়া লাগাতে পারেন আর এর অসাড় জিভে কথা ফোটাতে পারেন না? ডাক্তার কখনো কাটা মুণ্ডু জোড়া দিতে পারে? তবে তার কাছে চলেছেন কী বোকার মতো? নিয়ে আসুন আপনার মড়ার হাড়, পরুন আপনার কালো পোশাক, অন্ধকার করে দিন ঘর, বাঁচিয়ে তুলুন আমার দিদিকে!'

সদাশিব অনুপমার শিয়রের কাছে বসে পড়লো।

ক্রমে-ক্রমে লোক-জন এসে জমা হতে লাগলো। বাঁশ কেটে তৈরি হলো শবশয্যা। ছেলেছোকরারা গামছা বাঁধলো কোমরে।

সত্যি-সত্যি যখন দিদিকে ওরা বের করে নিয়ে যাচ্ছে, তখন রাসেশ্বরী মেঝের উপর ছড়িয়ে পড়ে মাথামুড় খুঁড়ে বুক চাপড়ে অসম্ভব কান্না জুড়ে দিল। এ রকম বিশ্বপ্লাবী শোকের মাঝেও একটা রূপ আছে, ভাবলো সদাশিব। এমন প্রসারিত আত্মবিস্মৃতির মাঝে।

কঠিন হাতে তাকে জাপটে ধরে তার অঙ্গবিক্ষেপগুলোকে সংযত করবার চেষ্টায় সদাশিব এগিয়ে গেল। গায়ে হাত ঠেকতে না ঠেকতেই রাসেশ্বরী তার দুহাতের বুড়ো আঙুল দুটো সদাশিবের মুখের কাছে তুলে ধরে ব্যঙ্গ-বক্র গলায় বললে, 'ছাই, ছাই, ছাই ম্যাজিক জানেন আপনি।'

রাত নটার মধ্যেই দাহ শেষ হয়ে গেল, কিন্তু সদাশিব যখন বাড়ি ফিরলো সব সাঙ্গ করে, মনে হলো কত অল্পেতেই যেন রাত কত গভীর, কত অন্ধকার হয়ে উঠছে।

রাসেশ্বরী থেকে-থেকে করণীয় যা তা করছে, আবার একটু ফাঁক পেলেই অনুপমার রিক্ত তক্তপোষটার উপর উপুড় হয়ে পড়ে শোক করছে।

ছোট ছেলেমেয়ে দুটো পাশের বাড়িতেই থেকে গেছে, বড়ো ছেলেটা কম্বল বিছিয়ে মাটির উপর শোয়া সদাশিবেরই এক পাশে, ও-ঘরে অনুপমার তক্তপোষের উপর পড়ে আছে রাসেশ্বরী, কান পেতে শোনা যাচ্ছে তার নিদ্রাক্রান্ত নিশ্বাসের শব্দ, বড়ো বেশি স্তব্ধতা বলেই বোধহয় শোনা যাচ্ছে, আর দুঘরের মাঝখানে উচ্চ শিখায় জ্বলছে একটা লণ্ঠন।

ভয়ে সদাশিবের গা কেমন ভারী হয়ে উঠছে।

একটা স্বপ্ন দেখছিলো রাসেশ্বরী। কোথা থেকে কালো পোশাকপরা কে-একজন জাদুকর এসেছে এ বাড়িতে, তার হাতে মড়ার হাড়ের ছোঁয়া লেগে দিদির অবশ অঙ্গ নড়ে উঠেছে, দেখতে-দেখতে বন্যার জলের মতো দিদির শরীরে নেমে এলো স্বাস্থ্যের উচ্ছ্বাস, লাবণ্যের প্লাবন। দেখতে-দেখতে দিদির বদলে দিদির জায়গায় দিদির তক্তপোষের উপর চলে এলো

সে—রাসেশ্বরী। দিদির থেকে সে এলো বেরিয়ে—ডিমের থেকে মুরগির মতো। অদ্ভুত ম্যাজিক—দিদির অসুখ কেমন সারিয়ে দিল সেই জাদুকর।

'অদ্ভুত ম্যাজিক—তোমার দিদির অসুখ কেমন সারিয়ে দিলাম, কেমন বাঁচিয়ে তুললাম তোমার দিদিকে।' রাসেশ্বরী তার পিঠের উপর অনেকখানি জায়গা জুড়ে গরম একটা হাতের স্পর্শ পেল, কে যেন তার কানের কাছে মুখ এনে অতি মৃদু অথচ অতি গাঢ় স্বরে বললে, 'তোমার দিদি কেমন বদ্‌লে গেল, নতুন হয়ে উঠলো দেখতে-দেখতে। টবের মরা গাছ কেমন ফুলন্ত হয়ে উঠলো চোখের সামনে। কেমন সে ফিরে এলো তার নিজের ঘরে নিজের জায়গায় নিজের তক্তপোষে। ম্যাজিক—ম্যাজিক—'

'কে?' রাসেশ্বরী ভীত অথচ প্রখর আর্তনাদ করে উঠলো।

কেউ নেই। কাউকে দেখা গেল না।

তবু ভয় গেল না রাসেশ্বরীর। ধড়মড় করে উঠে বসলো। ঘরের চারদিকে চেয়ে দেখলো, কেমন বিশ্রী অন্ধকার। চেয়ে দেখলো লণ্ঠনের শিখাটা অনেক নিচে নামানো, দরজার এক পাশে আড়াল দেয়া।

'কে, কে এখানে?' রাসেশ্বরী চেঁচিয়ে উঠলো।

কোনো সাড়া-শব্দ নেই, কেউ দাঁড়িয়ে আছে বলেও মনে হয় না।

তবু একটা উপস্থিতি বুকের উপর পাথরের ভারের মতো রাসেশ্বরী যেন অনুভব করলো। বললে, 'কে? ভূত? কথা নেই কেন তবে?'

'আমি ম্যাজিক—' অন্ধকারের মধ্যে থেকে কে অস্পষ্ট শব্দ করে উঠলো।

'ম্যাজিক দেখাতে এসেছিলেন? কিসের?' নিজেকে অনেক হালকা বোধ করলো রাসেশ্বরী। তক্তপোষ থেকে নেমে দাঁড়ালো। অন্ধকারেই বিশৃঙ্খলাগুলোকে সে সংযত করলে। বললে, 'বলুন, ম্যাজিকটা কিসের?'

অদৃশ্য দুটো হাত হঠাৎ রাসেশ্বরীর দুই হাত শক্ত করে চেপে ধরলো।

তারপর যার হাত সে বললে, 'চলে-যাওয়া লোককে ফিরিয়ে আনার ম্যাজিক। এক দিন দেখতে চেয়েছিলে না? আজ দেখ—দেখ—'

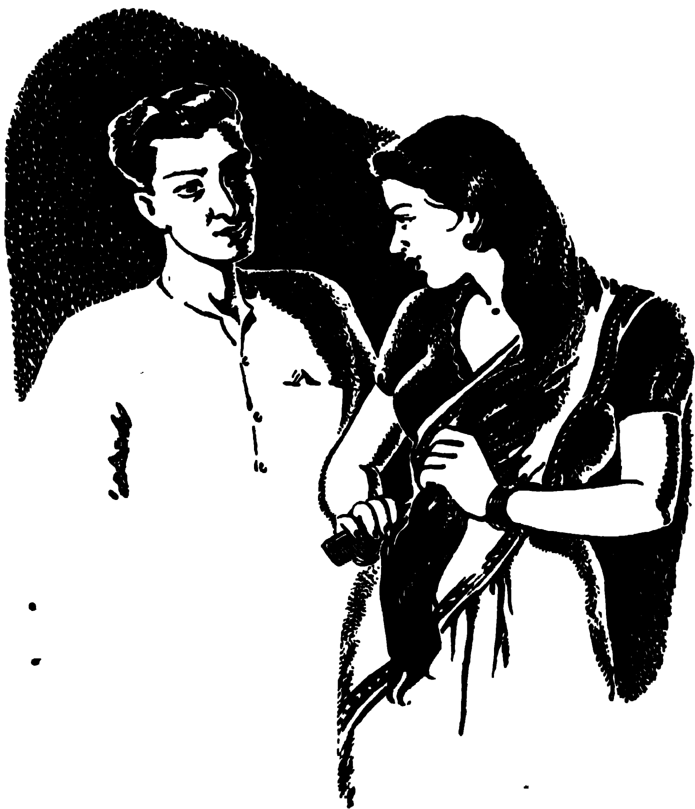
'দাঁড়ান,' রাসেশ্বরী হেসে উঠলো: 'আলোটা বাড়িয়ে নি। আলো না হলে দেখবো কি-করে?'

হাত খসিয়ে নিয়ে রাসেশ্বরী দরজার কাছে গিয়ে লণ্ঠনের পলতেটা উঁচু করে দিল। আলোটা হাতে নিয়ে এগিয়ে এসে দেখলো, সদাশিব—কালো পোশাক পরা, হাতে জাদুকরের কাঠি, মড়ার হাড়।

রাসেশ্বরী খিল-খিল করে হেসে উঠলো। লণ্ঠনটা উঁচু করে সদাশিবের মুখের কাছে তুলে ধরে সে বললে, 'চলে-যাওয়া লোককে ফিরিয়ে আনার ম্যাজিক দেখাতে এসেছেন? কিন্তু আপনি কি আমার সেই চলে-যাওয়া লোক?'

বলে লণ্ঠনটা সদাশিবের পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে রাসেশ্বরী পাশের ঘরে গিয়ে সদাশিবের ছেলের পাশে কম্বলের উপর শুয়ে পড়লো।





বিদিশা

শেষরাত্রের দিকে মোলায়েম মেঘ করেছে। পড়ছে টিপিটিপি বৃষ্টি। ভোর হয়ে গেলেও মনে হয় যেন হয়নি। অন্তত মন যেন খুশি হয় না মেনে নিতে।

অন্যরকম মন নিয়ে আর্য এসে হাজির। সেই বিশ্রী অসময়ে। মেঘের এত ভার আর শোভা সত্ত্বেও যে-ঝড় আসেনি সেই ঝড়ের চেহারায়।

'এ কি বাসব-দা, এখনো ঘুমিয়ে?'

'ঘুমিয়ে নেই ভাই, শুয়ে। ঘুমিয়ে থাকলে দরজা খোলা পেতে কি-করে?'

হ্যাঁ, দরজা খোলা বটে। কিন্তু তার মানে কী? কেউ ভিতরে আসুক, না, কেউ বেরিয়ে যাক অন্ধকার থাকতে-থাকতে?

'নিচে সিঁড়ি দিয়ে কাকে নেমে যেতে দেখলাম?'

'কাকে দেখলি?'

'মেয়ে একটা।'

বাসব-দা'কে ইতস্তত করতে হয় না। 'ও! বিদিশা এসেছিলো বোধহয়।'

আশ্চর্য, সেই বাসব-দা! একটা মেয়ের নাম বেশ স্পষ্ট করে উচ্চারণ করেন। একটু থেমে-থেমে। একটু-বা টেনে-টেনে।

'ভাবলো, বোধহয় ঘুমিয়েই আছি। এ দিকে দরজা যে খোলা—' বাসব-দা উঠে বসেন।

ভাবো! ভোর হলে যে জাগেনা সে জাগে একটা মেয়ের অন্তর্ধানের অন্ধকারে!

'আপনার বিছানাটা কী নরম, বাসব-দা!'

'এত বচ্ছর জেল খেটে আসার পরও এই নরম বিছানাটুকুও আমাকে দিবি নে?'

সত্যি, মানায় না বাসব-দাকে এই নম্র নিবেশে। এই গোলালো বিশ্রামে। শুধু অলস নয়, আবিষ্ট। অবরুদ্ধ। আরাম যেন তাকে আঁকড়ে ধরেছে। পুলটিসের মতো।

ঢিলেঢালা পোশাক। গা-এলানো বিছানা। আধ-হেলা ইজিচেয়ার। সেই ধৃষ্ট মেরুদণ্ড আজ কেমন নেতিয়ে পড়েছে। জলছেন ঢিমে আঁচে।

শুধু শ্রান্ত নয়, সীমাঙ্কিত।

শুধু অকর্মক নয়, নিঃসম্বল।

বিস্রংস। শৈথিল্য। দায়িত্বহীনতা।

'একটা কিছু করুন, বাসব-দা।'

'সেই কথাটাই বলবার জন্যে তুই এই ভোরে উঠে এসেছিস নাকি?'

'হ্যাঁ, সকাল-দুপুর সন্ধে-রাত সব সময়েই আমি উঠে-উঠে আসছি। বলতে পারছি না। টিকতে পারছি না। কিছু একটা করুন।'

বাসব-দা হাসেন। বলেন, 'কাজ ফুরিয়ে গেছে। কিম্বা আমি ফুরিয়ে গেছি।'

'কিছুই ফুরোয়নি। কিছুই ফুরোয় না। জানলা বন্ধ হয় আবার খোলে। কিন্তু আকাশ অফুরন্ত। আপনি আসুন।'

'আমি?'

'হ্যাঁ, আপনি। আপনি জানেন না—'

সত্যিই। জানেন না বাসব-দা। কিম্বা ভুলে গেছেন। কেমন একদিন কোটাল ডেকেছিলো তাঁর ডাকে। ঝড় এসেছিলো অগ্নিকোণ থেকে। কেমন সাঁতরেছিলো সব নদী। ডিঙিয়েছিলো পাহাড়। ডুবিয়েছিলো ভরা।

'দেখবেন এসে, এখন নতুন আকাশের চেহারা। খড়ের রঙের আকাশ। কাস্তের মতো চাঁদ। হাপরের মতো সূর্য। পাটাতনের গায়ে খুদি-খুদি পেরেকের মাথার মতো তারা। দেখবেন এসে নতুন মানুষের জনতা। পাথরে কুঁদে, বাটালি দিয়ে কেটে, র‍্যাদা দিয়ে ঘসে মানুষ তৈরি হয়েছে। ঝরা আর পড়া। ভাঙা আর টোল-খাওয়া। রাজপথ দিয়ে টেনে চলেছে রথ। আসুন, আপনিও হাত দিন রশিতে।'

পুরোনো আঙারের টুকরো ফিনিক দিয়ে ওঠে বুঝি তাঁর চোখের কোণ থেকে।

'কিন্তু টাকা, টাকা আছে? টাকা দিতে পারবি?'

কে না জানে টাকার টঙ্কারের কথা। টাকা না থাকলে ত্যাগের পর্যন্ত মহিমা কীর্তন হয় না। তবু বাসব-দা'র হাত-পাতার ভঙ্গির মধ্যে সেই দস্যুতার ঔদার্য নেই। অবার্যতা নেই। কেমন একটা ভিক্ষার অনুপায়। মিনতির দীনতা।

তবু মানুষে কিছুতেই বিশ্বাস বা আশা হারাতে ইচ্ছে হয় না। ঠিক জায়গাতে টেপ, দেখবে অমনি আলো জ্বলে উঠেছে।

'হ্যাঁ, দেব টাকা। আসুন আপনি। ঠিক টিপুন সুইচ, আলো জ্বেলে দিন চোখে-মুখে, ঘরে-ঘরে শহরে-জঙ্গলে। ঠিক আলো আর ঠিক ছায়াতে মিশিয়ে দেখিয়ে দিন দেখবার কোণটা!'

চায়ের দামি গন্ধ। অক্রিয় অবকাশ। মোহাঙ্কিত মুহূর্ত। তবু আর্য টলে না একচুল। দেয় না টলতে।

কিন্তু বাসব-দা যদি একবার জাগেন। যদি খাপের সঙ্গে তলোয়ারের ঠিক জোখা মিলে যায়! যদি হাতে একবার টিপ আসে! যদি একবার ধরে ফেলতে পারেন সেই ভাসমান সুর।

ভয় নেই, বিদিশার মাঝে আছে সেই প্রতিশ্রুতি। সেই ভ্রূণায়মানতা। সে ঠিক জাগাতে পারবে বাসব-দা'কে। নড়িয়ে ঝরিয়ে দিতে পারবে।

'এ কে বাসব-দা?'

'ও আমাদের সেই অবন্তীর ছোট বোন।'

'কে অবন্তী?'

'আরেক নাম উজ্জয়িনী। উৎজয়িনী। ও, তুই তো চিনিস না তাকে।' বলেন সে একটা গল্প যা শোনায় প্রত্নতত্ত্বের মতো। সে এক অভাবিত মেয়ে, অপ্রতিবন্ধ। যাব বলে এসেছিলো, চলে গেল। কিছুরই মূল্য ছিল

না তার কাছে, মানুষ যাকে বলেছে ঈশ্বর বা সতীত্ব। বুঝতো সে তার দল। তার সূর্যমণ্ডল। সে মাত্র একটা পিলসুজ। মাত্র আধার। বাতি ধরবার জন্যে। যৌবনের বাতি। মৃত্যুর বাতি। তোমরা এসো, রাখো তোমাদের জাগপ্রদীপ, যতক্ষণ না শেষ হয় পূজা।

'কোথায় তিনি?'

'বললুম, মরে গেছে।'

'কিসে?'

'ব্যারামে। যক্ষ্মায়। তখন বছর দশ-বারোর মেয়ে এই বিদিশা, যখন মারা যায় অবন্তী। বললে, ওকে দেখো, বাসব-দা। দেখো, ও যেন আমার পথে না আসে। ও যেন সামান্য হয়। সাধারণ হয়। দ্বারস্থ না হয়ে গৃহস্থ হয়।'

'তার মানে, ও যেন কাদাকাঁটার পথ ছেড়ে চলে আসে সহজ কাঁদাকাটার পথে।' আর্য টিপ্পনি কাটে।

'জেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখি কত বড়ো হয়ে গেছে বিদিশা।'

এই বড়ো মানে বয়সে বড়ো। লম্বায় বড়ো। কেমন একটা ঝাপসা তৃষ্ণা যেন তাঁর চোখে লেগে থাকে। 'দেখো বিদিশাকে।' অবন্তী-দি'র অনুরোধে এই বোধহয় তাঁর দেখা। এমনি করে। এত দিন পরে।

আর্যর বিশ্বাস হয় না বিদিশা জোলো। বিশ্বাস হয় না, আঝালী। বিশ্বাস হয় না, অবন্তী-দি জামিন রেখে যাননি।

দেখেছে অনেক চোখ। কূট ও মদির। অনেক হাসি। তিক্ত ও তির্যক। এবার দেখে চুল। গহন ও বিক্ষুব্ধ।

বিদ্যুৎ। মরুমাঠ। এবার দেখে অরণ্য। নির্জন, নিষ্প্রবেশ।

এত চুল থাকতে পারে, পিঠ ছেয়ে কোমর ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে প্রায় পায়ের গোছার উপর এ না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না। বিপুল বিপর্যাস। এত যার চুল সে নিশ্চয়ই নিয়ে আসতে পারবে ঝড়। অন্ধ অন্ধকার। নিশ্চয়ই জাগাতে পারবে বাসব-দা'কে।

'আমি এখানে এলুম, এ-বাড়িতে। বলুন, ভালো করিনি?' বাঁ-হাতের মুঠোয় এক বোঝা চুল নিয়ে ডান হাতে চিরুনি দিয়ে জট ছাড়াতে-ছাড়াতে বিদিশা বলে।

সঙ্গে ভাঙা ট্রাঙ্ক। বেমলাট ছেঁড়া বই। স্বল্পকায় বিছানা।

আর্যর কোনোই মত নেবার দরকার ছিল না। তবু স্বস্তি পায় না বিদিশা! পায়না স্বচ্ছতা! তাই সেদিন অমন প্রচ্ছন্ন ভোরবেলায় আর্যকে দেখে সরাসরি ঢুকতে পারেনি সে। আজ পেরেছে। জেনেছে কোথাও রয়েছে এতে এর সম্মতির আশীর্বাদ।

'ভালোই করেছ।' বলতে পেরেছে আর্য।

একেকজনের সঙ্গে মন আগে থেকেই প্রতিবেশী হয়ে থাকে। বিশেষ যখন স্বরূপে ঘটে আনুরূপ্য। আর্য আর বিদিশা দাঁড়িয়েছে এসে একই জানলায়। কোনোই ব্যবধান নেই। দেখছে একই সমতল পৃথিবী। একই অনপেক্ষ আকাশ। একই উন্মিষিত ভবিষ্যৎ।

'হ্যাঁ, যদি পারো এবার বাসব-দাকে জাগাতে।'

'পারবো?' দুরবেধী শরের মতো ঝিলকিয়ে ওঠে তার দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা।

'পারবে।'

অপ্রকম্প শিলা। অনাবিদ্ধ পাখি। অ-হল্য মৃত্তিকা। কী দুর্বার শক্তি তার সেই নির্দয় কৌমার্যে।

'কিন্তু বাসব-দা'র মনে ভয়ানক দ্বিধা। ঘাড়ের এক ঝাঁকানি দিয়ে পুরোনোকে পুরোপুরি 'না' করতে পারেন না।'

'ভেঙে ফেলতে হবে সেই দুর্বলতা। হ্যাঁ, হৃতবল প্রবলের দুর্বলতা।'

'নিষ্ফলতাটা বোঝেন, কিন্তু তবু যেন মায়া ছাড়তে পারেন না।' বিদিশার কণ্ঠে একটু কেমন করুণার আমেজ লাগে।

'এই মায়ার বিরুদ্ধেই তো আজ মন্ত্ররচনার দিন। সমুদ্র যার ঠিক আছে, নদী তার ঠিক ধারায় প্রসারিত হবে না কেন?'

'পারবো ঘুরিয়ে দিতে।' হঠাৎ হাত আলগা করে চুলের ভারটা বিদিশা ছেড়ে দেয়। কাঁধ বেয়ে পিঠ ভরে পাছা ঢেকে ভেঙে পড়ে। শব্দ হয় অরণ্যের চাপা দীর্ঘশ্বাসের মতো।

তার চুলে সে কী বহুল ব্যাকুলতা! যেন ঢেকে ফেলতে পারে বুকের মানুষকে!

'যদি পারো, অবন্তী-দি'র নাম থাকবে।'

আস্তে-আস্তে স্বপ্নের ঢেউ এসে লাগে বাস্তবের রূঢ় তটে। শ্যাওলা জমতে থাকে। মনে হয়, দুজনেই বুঝি ভয় পেয়ে গেছে। শুধু বাসব-দা নন, বিদিশাও।

বাসব-দা যেন আরো ডুবেছেন এসে আলস্যের ক্লেদকুণ্ডে। বিদিশাও যেন অন্তঃপুরে অন্তর্হিত হয়ে নির্ঝঞ্ঝাট কোণ খুঁজে বেড়াচ্ছে। বাসব-দা বিপ্লব খুঁজছেন তাঁর আদিম ধমনীতে। বিদিশা তার চুলে নিজের মুখ ঢেকে প্রতীক্ষার লজ্জা লুকোচ্ছে।

না জেগে চক্ষু বিস্ফারিত করেছেন বাসব-দা। গদ্গদ জ্যোৎস্নায় দেখছেন তিনি এখন জনস্পর্শহীন পাহাড়ের ঐশ্বর্য। আর, কে না জানে, পাহাড়ের ঐশ্বর্য তার শষ্পাবরণে নয়, উগ্র, রুক্ষ রিক্ততায়। উচ্চাবচতায়।

মেঘ যেমন ময়ূরকে জাগায় তেমন করে নয়। বাতাস যেমন আগুনকে জাগায় তেমন করে।

কিন্তু বিদিশা নিজেকেই শুধু জাগিয়ে রাখছে।

একদিন চলে আসে আর্য।

ফিটফাট ঘরদোর। একটু যেন বা নির্লজ্জের মতো সুশৃংখল। কোথাও উদ্ধত উদ্যম নেই, শুধু দ্যুতিহীন নিরতি। স্তব্ধীভূত প্রতীক্ষা।

'কী করছ?'

'ঘর ঝাঁট দিয়ে বিছানা করে চুল বাঁধছি।' বিদিশার চুল আজ বুকের উপর ভুর-করা।

‘তোমার বিছানা কোথায় ?’ প্রশ্নটা প্রখর।

‘ঠিক নেই। কখনো পাশের ঘরে, কখনো বা স্পষ্ট এ-ঘরের মেঝের উপর।’ উত্তর সপ্রতিভ।

‘এই বুঝি তোমার জাগানোর নমুনা ?’

‘দেখো, আমার যা পদ্ধতি তা আমার। প্রশ্ন কোরো না। শুধু দেখো। অপেক্ষা করো।’

‘অপেক্ষা করবো ?’

‘হ্যাঁ, এখন যেটুকু শক্তি ওঁর অবশিষ্ট আছে তা লড়বার শক্তি নয়, আঁকড়াবার শক্তি। শোষবার রক্ত যদিও আর নেই, তবু জোঁকের মতোই আঁকড়ে আছেন পুরোনোকে। ভুলের কঙ্কালকে। সেখান থেকে ছিনিয়ে আনলেই চলবে না, বিশ্বাস করাতে হবে নতুনের সম্ভাবনাকে। ওঁর কষ্টটা বুঝতে পারছি। সময় লাগবে।’

‘কিন্তু কষ্টটা কি শুধু ওঁরই ?’

‘আমারো। হয়তো ওঁরো চেয়ে বেশি। এখনো জাগাতে পারছি না, তাই ভেবে। অবন্তী-দি’র বোন হয়েও।’

বীরব্রতা বিদিশা !

বাড়ি বদলেছেন ওঁরা। এবার একখানা ঘর। বস্তি-পাড়ায়। আরো ঘিঞ্জিতে। আরো নেমে গেছে অবস্থা। কিন্তু দুঃখের দাহদীপ্তি নেই। আছে একটা রঙিন বিমর্ষতা।

‘কী করছেন ?’ আর্য বাসব-দা’র মুখোমুখি হয়।

‘কী করেছি এতদিন, তাই ভাবছি বসে-বসে।’ ভগ্ন ভঙ্গি তাঁর ইজিচেয়ারে।

‘কী করবেন তার চেয়ে কী করেছেন-টাই বড়ো আপনার কাছে ?’

‘জানিনে। ইচ্ছে করে কোথাও চলে যাই।’

‘পালিয়ে যাবেন ?’ আর্য ধনুকের মতো বেঁকে আঁট হয়ে ওঠে।

'জায়গা পাচ্ছিনে। যদি বা পাচ্ছি জানতে পাচ্ছিনে কোথায় যাব। বুঝতে পাচ্ছিনে, দল বড়ো না দেশ বড়ো। আমাকে তোরা ছুটি দে।'

'যেদিন বেরিয়েছিলেন মা'র আঁচলের গিঁট ছেড়ে, ভেবেছিলেন কোনোদিন ছুটি নেবেন?'

'বোধহয় নয়। যেখানে চলে এসেছি, মনে হচ্ছে, সেখান থেকে এগোতেও পাচ্ছিনে, ফিরতেও পাচ্ছিনে। সামনে-পিছে কোথাও রাস্তা নেই।'

'আছে রাস্তা। এই বাঁয়ে—'

বাসব-দা চুপ করে থাকেন।

সেই নিঃসঙ্গ বনস্পতির মতো দেখায় না আর বাসব-দা'কে। যে, হোক পুষ্পহীন, কিন্তু ফলদ!

দেখে বিদিশাকে। ও-ও কথা বলেনা। হাসে। এখনো যে আশা হারায়নি তার হাসি।

ওর উৎসুক হাতে দিৎসা। কোমলাভ চোখে জড়িমা। কৃশীকৃত কটিতে কাকুতি। অনেক ভোঁতা, ঝাপসা এখন তার ভঙ্গি। অনিশ্চিত।

সন্দেহ কী, পুরোনোকেই আঁকড়াতে চান বাসব-দা। যা কিছু জীর্ণ, বিসর্জনীয়। সেই স্থাবর ঘর। সেই স্বার্থপর প্রসরহীনতা। জাদুকরী বিদিশার হাতে পুরোনো পাপ। জাগাতে এসে নিজে এখন পড়েছে ঘুমিয়ে।

'এ কি, ঘুমিয়ে আছ নাকি?' একদিন আর্য অবার্যরূপে দেখা দেয়।

'না, এসো।' বড নিমজ্জিত শোনায় বিদিশার কণ্ঠ।

দীপ্র রাত। দুর্মোচ্য অন্ধকার।

'আজকাল বুঝি তক্তপোষে উঠে এসেছ?'

'হ্যাঁ, বসো।'

'কেন, মেঝে কি দোষ করলো?'

'মেঝেতে বাসব-দা শোন।' বিদিশার নিশ্বাস যেন কান্নার মতো গুঙিয়ে ওঠে: 'পারলুম না, পারলুম না—'

এতটুকু চাপল্য নেই আর্যর ভঙ্গিতে। অগ্রসরণে। বলে, 'হ্যাঁ, জানি, তুমি পারবে না। তোমার দ্বারা হবে না। তাই আমি নিজে এসেছি তাঁকে জাগাতে।'

'তুমি?'

'হ্যাঁ, আমি। উনি আবার দুলে উঠবেন, ক্ষেপে উঠবেন। উনি যা তাই অন্তত উনি হবেন। বেশি না হোক, বরং ততটুকু। দেখতে পারছি না আর ওঁর এই অসহায় ত্রিশঙ্কুতা—'

আর্য দুহাত দিয়ে মুঠ-মুঠ করে ধরে বিদিশার চুল। স্পষ্টীকৃত ঝড়। বিদ্যুৎ-বিদারিত।

বিদিশা যেন ক্ষয়পক্ষের চাঁদ। রুগ্ন। সমর্পিত।

অনিষেধ্য।

'বাসব-দা কোথায়?'

'বাড়ি নেই।'

'ফিরেছেন আপিস থেকে?'

'চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন।'

'তবে আসতে পারেন যে-কোনো মুহূর্তে।'

'না-ও আসতে পারেন।'

'না, তিনি আসুন।'

কার বুঝি জুতোর শব্দ হয় বাইরে। দুর্বল শব্দ। পরিচিত পদপাত।

সর্বভক্ষ আগুনের শিখার মতো হঠাৎ নির্গত হয় একটা শাণিত চীৎকার।

শূন্যতার বুক চিরে অন্ধকারের রক্তধারা।

সে-কান্না কি উল্লাসের? প্রতিবাদের? ভয়ের?

না, আবেদনের?

এবার, এত দিন পরে, বুকের মধ্যিখানে একটা গুলি লাগুক তারি প্রতীক্ষায় আর্য চোখ বোজে।

অনেকদিন ধরেই চোখ বুজে আছে আর্য। চোখ যখন মেলে, দেখে বিদিশা একা।

বড়ো শূন্য দেখায় তাকে। ব্যয়িত। চ্যুতপত্র।

ঘরে-দোরে ঔদাস্য। অরুচি। অনায়ত্তি।

যে-বিশৃংখলায় তেজ থাকে তা নয়। বিপ্লবের প্রস্তুতি থাকে তা নয়। নিষ্প্রাণ এলোমেলোমি।

'বাসব-দা কোথায়?'

'চলে গেছেন।' বিদিশা চোখ লুকোয়।

'চলে গেছেন! কোথায়?'

'জেলে।'

'জেলে?'

'হ্যাঁ, তাঁর নিজের কুলায়ে।'

'কেন, কী হয়েছিলো?'

'কী আবার হবে! কিছুই হতে লাগে না। ইচ্ছে হলো, চলে গেলেন। ওদিকে মুখ করে দাঁড়ালেন ভঙ্গিটা বাঁকা করে—ব্যস, আর দেখতে হলো না।'

দ্রবীকৃত চোখ। নির্বাপিত ভঙ্গি। নির্বাসিত শরীর।

'কিছুই ওঁর কাছে বড়ো নয়। কিছুই নয়। নয়, কিছুই নয়। শুধু নিজের সুনাম। নিজের লজ্জামোচন। উটপাখির মতো বালিতে মুখ লুকিয়ে থাকা।'

বিদিশার দিকে তাকাতে লজ্জা করে। ভয় করে। বিদিশা কাঁচি দিয়ে তার চুলগুলি সব ছেঁটে ফেলেছে।

বাসব-দা যদি ওর গোটা মাথাটা ভোঁতা দা দিয়েও কেটে দিয়ে যেতেন, তবু যেন চোখ ভরে দেখা যেত সেই ছিন্নমুণ্ডটা। এর চেয়ে অনেক সহজে। ভদ্রভাবে। সুস্থ পরিমিতিবোধের আরামে।

'এ কী, তুমিও চললে ?' বিদিশা ডুকরে ওঠে।

'হ্যাঁ।'

'কোথায় ?'

'জানিনে। তবে জেলে কিম্বা মঠে নয়।'

আর্য পথের মাঝখানে এসে একটু থামে। তারপর আবার চলে যায়।





ঝাঁঝা

এ-পাড়াতে এমন কাউকে দেখতে পাবে ভাবতে পারতো না কেউ। এঁটোখেকো কাকের দল যেমন উচ্ছিষ্টের লোভে ঠোঁট ফাঁক করে বসে থাকে মেয়েগুলো তেমনি চোখ ফাঁক করে চেয়ে রইলো।

ঘাড় সোজা রেখে তাকিয়ে-তাকিয়ে দু-দু'বার ঘুরে গেল রেবতী। আরো একবার। এ-মোড় থেকে ও-মোড়। বসা থেকে উঠে দাঁড়ালো কেউ-কেউ, কেউ-কেউবা ভঙ্গিতে একটু বিভ্রম আনলে। তবু রেবতী চক্কর দিয়ে যাচ্ছে, শালের আঁচলের কাঁধ বদ্‌লে-বদ্‌লে। কার ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে তারি ঔৎসুক্যে কুরে-কুরে তাকাচ্ছে মেয়েগুলো।

রেবতীর তরফ থেকেও এ-কথা কেউ বিশ্বাস করতে পারতো না। সে উঁচু ঘরের ছেলে, উঁচু নাকের, উঁচু মাইনের সে চাকুরে—এ-সব কিছু নয়; বছর পুরো হয়নি বিয়ে করেছে সে। আর যাকে বিয়ে করেছে, সে তিল-তিল সৌন্দর্য দিয়ে তৈরি। যেমন রঙ, তেমনি অবয়ব। যেমন কচি তেমনি টাটকা। বিশ্বাস করতে পারতো না স্বয়ং সে নববধূ।

রেবতীর কিসের এ অতৃপ্তি? কিসের বা আকাঙ্ক্ষা ঐ মেয়েগুলোর?

মেয়েগুলো হাল ছেড়ে দিল, যখন আরো দুচক্কর ঘুরে গেল রেবতী। তার চোখ ও পকেট সম্বন্ধে দুটো বিপজ্জনক মন্তব্য করেও যখন সাড়া মিললো না। সিদ্ধান্ত করলে, নিশ্চয়ই পুলিশের গোয়েন্দা, কারো জন্যে অপেক্ষা করছে।

'তাই বলো।' হ্যারিকেনের পলতেটা কমিয়ে দিয়ে রোহিণী বললে, 'নইলে অমন দরের লোক আসবে কিনা এই খোলার বস্তিতে।'

'ছাড়ান দে।' বকের মতো গলা বেঁকিয়ে বললে রাজুবালা: 'ঢের দেখেছি। আগে যখন মাটকোঠায় ছিলাম, ধুচুনিপাড়ায়, তখন আমার ঘরে এক ব্যারিস্টার আসতো। ফতোবাবু নয়, দস্তরমতো সাহেব। প্যাণ্ট-কোট, জুতো-মোজা,—ফিতে-বাঁধা জুতো। তার জন্যে একটা চেয়ার রাখতে হয়েছিলো ঘরে, নিচে নেমে বসতো না কখনো বিছানায়।'

চক্করের পরিধিটা ক্রমে-ক্রমে ছোটো হয়ে আসছে রেবতীর। তার ভুল হচ্ছে কিনা কে জানে।

রাস্তাটা আসলে ধোপাপটি। তারই দুদিক দিয়ে দুটো ফালি গলি-পথ গেছে বেরিয়ে। তারি মধ্যে ঠেসাঠেসি করে মেয়েগুলো বাস করছে কায়কষ্টে। একটা ফুলুরির দোকান, একটা মুদিখানা। মাঝখানে হঠাৎ চটের পর্দাফেলা একটা একতলা কোটাবাড়ি, ভিতরে শিশুর শব্দ। রাংঝালের দোকান পেরিয়ে আবার ক'টা মেয়ের ছিটেফোঁটা। এদেরটা টিনের চালার বস্তি। কেমন একটু আলাদা, অসংলগ্ন।

শান-বাঁধানো সংকীর্ণ রোয়াকের উপরে বসে দুহাঁটুর মধ্যে মাথা রেখে বুড়ি একটা কাশছে, আর তার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কে-একটি অল্পবয়সী মেয়ে। অন্ততঃ ডৌল দেখে তাই মনে হয়। মাত্র আঁচল টেনে গায়ের শীত নিবারণের কঠিন চেষ্টা দেখে। অথচ, আশ্চর্য, এতটুকু চাঞ্চল্য নেই। বুড়ির যেই কাশিটা থামছে, অমনি ভাঙা গল্পের জের টানছে দুজনে। রেবতীকে পাশ দিয়ে শ্লথ পায়ে বারে-বারে চলে যেতে দেখেও তারা থামছে না, মনোযোগী হচ্ছে না। নড়ে-চড়ে সরে-বসে এতটুকুও সম্মতি বা সমর্থন আনছে না। পাশের ঘরটাই যদি ও-মেয়েটার হয় তবে তার বন্ধ নিশ্চল দরজায় রূঢ় অক্ষরে প্রত্যাখ্যানই লেখা আছে নিশ্চয়।

নিশ্চয়ই ভুল হচ্ছে রেবতীর। শীতে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলেই কেউ আর অপাঙক্তেয় হয় না। রেবতী বাড়িয়ে দিল তার পরিক্রমের এলাকা।

'মঙ্গলার সামনে ঘুরঘুর করছে।' গলির মুখের মেয়েগুলো বলাবলি করে উঠলো। রেবতীকে শুনিয়ে, একটু বা শ্লেষের সুরে। শুধু যেন অসাধ্য নয়, অন্যায়।

'খ্যাংরা ঝেড়ে দেবে কপালে।' কে একজন স্পষ্ট গলায় বলে উঠলো। স্থান ছেড়ে অস্থানে গিয়ে চড়াও হচ্ছে এ যেন তারই প্রতিবাদ। সরহদ্দ-সীমানা পেরিয়ে পাশ-আলি জমির লোককে বেদখল করার

বিরুদ্ধে নালিশ। একটা চাপা শব্দ মেয়েগুলোর গলার মধ্যে অস্ফুট হয়ে রইলো।

তবু যেন রেবতী নিবে যেতে পারলো না। নতুন জ্যোৎস্নায় কী যেন সে দেখেছে বলে তার মনে হচ্ছে।

কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়ার চাঁদ উঠে এসেছে দেয়ালের আড়াল ছেড়ে। বড়ো রাস্তায় সফর করতে বেরিয়েছিলো কতগুলি মেয়ে, যাদের শরীরে এখনো সাহস আছে, মুখে বা আশা, তাদেরই কেউ-কেউ ফিরছে এখন শিকার জুটিয়ে। তাদেরই কে একজন বললে মঙ্গলাকে উদ্দেশ করে: 'কী লো মঙ্গলা, এখনো বাইরে দাঁড়িয়ে?'

মঙ্গলা বোধ করি লুকিয়ে একবার তাকালো রেবতীর দিকে। বললে, 'কী করবো ভাই, টোপ ধরে না, ঠুকরে বেড়ায়।' বলেই লম্বা দমে হেসে উঠলো। হাসিটাও অদ্ভুত। হালকা পাখায় এক ঝাঁক পাখির উড়াল দেবার মতো। শব্দটা এ-অঞ্চলের বাইরেকার শব্দ। ঘোলা জলে কখনো এমন বুদ্বুদ ফোটেনা।

তবু, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে নির্ভুল এগিয়ে গেল রেবতী।

মঙ্গলা কুঁকড়ে গেল। আর বুড়ি বলে উঠলো: 'পোড়ামুখো মিন্সে—'

মুহূর্তে রেবতী গুটিয়ে নিল নিজেকে। ফটফটে জ্যোৎস্নায় মঙ্গলার হাতে দেখতে পেল সে দুগাছি শাদা শাঁখা। তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল সে গলি ছেড়ে।

কিন্তু সেই চকিত চাউনিতে কী যেন বলি-বলি করে উঠেছিলো মঙ্গলা। তাই পর দিন সন্ধে ধূসর হয়ে ওঠবার আগেই আবার রেবতী সেই গলির মুখে পা বাড়ালো।

তখনো গলিটা তার চিহ্নিত চেহারা পায়নি। আধাখেঁচড়া এলোমেলো হয়ে আছে। এখন যদি কোনো তল পাওয়া যায় মেয়েটার। তার প্রাত্যহিক পরিবেষ্টনে।

রাস্তার কলের কাছে বসে মঙ্গলা একটা পিতলের থালা মাজছিলো। এক নিমেষে চোখোচোখি হলো দুজনের। কাল অনেকক্ষণ ঘুরে গেছে তার আশে-পাশে—যেন চিনতে পারলো মঙ্গলা। কী ভেবে চোখে আর সেই পরিচয়ের প্রশ্রয় রাখলো না, মুখ ঘুরিয়ে নিল। রেবতী দেখলো, হাতে তার শাঁখা আছে বটে, কিন্তু সিঁথি নিশ্চিহ্ন।

বুক বেঁধে রেবতী এগুলো দুপা। বললে, 'তোমাদের এখানে ঠিকে ঝি পাওয়া যায়?'

'তাই খুঁজছেন বুঝি দুদিন ধরে?' চোখে ঝিলিক দিয়ে মঙ্গলা মুখ টিপে হাসলো।

'হ্যাঁ, পাচ্ছিনে সুবিধেমতো। তুমি করবে কাজ?'

'আবার ঝি-গিরি! খুরে দণ্ডবৎ মশাই।' গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো মঙ্গলা।

'তুমি তবে কী কর?'

'হিরু গয়লার খাটালে কাজ করি। গোরু-মোষের খাটাল। খাটতে-খাটতে জান শেষ। পেরে উঠিনে।' মুখে একটা অতিক্লান্তির আর্তি আনলে।

রেবতী ভেবে পেলো না এ নির্দয়াচরণ কেন? এমন যার ফুলন্ত ও ফুটন্ত দেহ সে কেন ঘাঁটতে যাবে ঐ আবর্জনা? হৃদয় দৃঢ় করে ফের সে প্রশ্ন করলো: 'তুমি থাক কোথায়?'

'কোথায় আবার! এই গলিতে।'

'ঘর কোনটা?'

'ঐটে।'

যেটা সেদিন দেখেছিলে দোর-দেয়া।

'তোমার সঙ্গে বুড়ি কে-এক গল্প করছিলো কাল—কে সে?'

'আমার মা।'

থালা হাতে করে মঙ্গলা ফিরে গেল তার ঘরে। ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলে। পিছনে একটিবার ফিরেও তাকালো না।

রেবতী পথ দেখলো।

কিন্তু পর দিন বিকালে আবার সে এসে হাজির। যথার্থ সাহস দেখানো হয়নি, আজ সে স্পষ্ট প্রস্তাব করবে। রাখে, ভালো; না রাখে, আরো ভালো। গালিগালাজ না শুনতে হলেই হলো, একটা কোনো কুচ্ছিত চেঁচামেচি। মঙ্গলাকে যে রকম স্বচ্ছন্দ মনে হয় তাতে 'না' বলতে হলে সে ঠাণ্ডা গলায়ই 'না' বলবে।

কালকের মতোই পাঁশুটে সন্ধে, কিম্বা আরো একটু নিবিড়। আশ্চর্য, গলির কিছুটা ভিতরে পাকুড় গাছের নিচে মঙ্গলা দাঁড়িয়ে আছে। যেন অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। যেন বা কার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। পরনে কালকের সেই ধূলট শাড়ি, অপীন দেহের পক্ষে আঁচলটা এত পর্যাপ্ত নিচে জামা আছে কিনা বোঝা যায় না, চুলগুলি ঝাঁকড়-মাকড়। অসহিষ্ণুতার যন্ত্রণায় চোখ দুটো চকচক করছে।

'রাত নটার পরে আসবেন।' পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার আগেই মঙ্গলা রেবতীর উদ্দেশে বললে নিচু গলায়। আর বলেই অন্তর্ধান করলে তার ঘরে, ভয়-পাওয়ার মতো। এমন দ্রুত শব্দে দরজা বন্ধ করলে যেন তাকে তাড়া করেছে।

অনেক অনাঘ্রাত প্রেমেও এমন রোমাঞ্চ রেবতী পায়নি। চঞ্চল-অচল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সে কতক্ষণ, তারপর চলে গেল দূরের রাস্তায়।

রাত নটার পর যখন সে ফিরে এলো চুপিসারে, তখন খাওয়া-দাওয়া সেরে খোলা দরজার দিকে পিঠ করে বসে মঙ্গলা পান সাজছে। কোনো ইঙ্গিতের প্রতীক্ষা না করেই রেবতী বেমালুম ঢুকে পড়লো। আর বিন্দু-মাত্র বিস্ময় প্রকাশ না করে মঙ্গলা দরজা বন্ধ করে দিলে। যেন এর মধ্যে কোনোই নতুনত্ব নেই। যেন ডাল-ভাত।

দরজাটা বন্ধ করলেই নিরাপদ হওয়া যায় না। তার অনেকাংশেই থেকে যায় অনাবৃতি। একটা ছেঁড়া নোংরা কাপড় দিয়ে মঙ্গলা সেই ফাঁকগুলি ভরে দিতে লাগলো। সেই অবসরে ঘরের আরো অনেক কিছু দেখে নিলে রেবতী। আর, সমস্ত কিছু দেখে নিলে সে উলঙ্গ কুপির কলঙ্কিত শিখায়।

ইঁটের উপরে পা-তোলা উঁচু তক্তপোষ—একমাত্র রাজাসন। পাটির অতিরিক্ত শয্যা নেই। দেয়ালে নেই একটা পট, নিদেন জলচৌকির উপরে ক'টা বাসন। সামান্য একখানা আর্শি নেই কোথাও, ফুলেল তেল বা মুখে-ঘসার পাঁক। দড়িতে ঝোলানো অন্তত রঙিন্ শাড়ি একখানা।

তক্তপোষে সমাসীন হলো রেবতী, মঙ্গলা ঘাড় নিচু করে পান সাজতে লাগলো।

'এখানে কদ্দিন আছ ?'

কেমন আর্দ্র শোনালো মঙ্গলার গলা : 'এই দশ বছর।'

'দশ বছর ! বলো কী ? দশ বছরেও এই হাল !'

মঙ্গলা কথা বললো না। রেবতী লক্ষ্য করে দেখলো তার শিথিল আঙুলের বেষ্টনী থেকে পানের খিলি খুলে যাচ্ছে।

'এই তো তোমার এখন গুছিয়ে নেবার বয়স—করলে কী এত দিন ? তা ছাড়া এমন খোলতাই চেহারা তোমার, তাজা আনাজের মতো। শোনো, শোনো,' হাত বাড়িয়ে রেবতী ধরতে গেল মঙ্গলাকে : 'আমি যখন এসে পড়েছি একবার, আর তোমার ভয় নেই। তোমার হাল-চাল বদ্‌লে দেব একদিনে।'

মঙ্গলা হঠাৎ কেঁদে ফেললো। বললে, 'সেই ভরসায়ই তো দরজা আপনাকে আজ খুলে দিলাম, বাবু।'

এই অসম্ভব কথাটার জন্যে প্রস্তুত থাকলেও কান্নার জন্যে রেবতী কখনো প্রস্তুত ছিল না। আগে ফুলে-ফুলে কান্না, এখন একেবারে হু-হু শব্দে।

শুধু কান্না নয়, দুই ব্যাকুল হাতে মঙ্গলা রেবতীর পা দুটো জড়িয়ে ধরলো : 'আপনিই আমাকে এই প্রথম কুলের বার করলেন, আপনি আর আমাকে পায়ে ঠেলবেন না।'

রেবতী চোখে অন্ধকার দেখলো। শুধু মঙ্গলার শাঁখা শ্বেত বজ্রাগ্নির মতো জ্বলতে লাগলো সেই অন্ধকারে।

সিধে, সমতল পথের পথিক রেবতী, ভয় পেয়ে গেল এই দুর্গম, দুরারোহ পথের ভূমিকায়। ভীত, মূঢ় গলায় বললে, 'কুলের বার করলাম মানে? এই তোমার নতুন নাকি?'

'হ্যাঁ বাবু, এই নতুন, আপনিই প্রথম। এত দিন, এই দশ বছর, আমি এক জনের কাছেই বাঁধা আছি।'

রেবতী নিশ্বাস ফেললো। নিশ্বাস ফেললো মঙ্গলার এই নিষ্ঠানাশের বেদনায়। জিগগেস করলো : 'কে সেই বাঁধা লোক?'

'বাড়িওলা।' যেন অনেক মমতায় তার কথাটা মঙ্গলা উচ্চারণ করলে।

'কে, এই বস্তির বাড়িওলা?' কেলেঙ্কারির ভয়ে আঁতকে উঠলো রেবতী।

'না। সে তো ছিরু গয়লা। আমার এ-বাড়িওলা বামুন। আর তার বাড়ি নেই একখানাও।'

'এই দশ বছর তার কাছেই আছ?'

'তার কাছেই আছি। কিন্তু সে আর টানতে পারছে না আমাকে।' আবার মঙ্গলার চোখ ছাপিয়ে কান্নার ঢেউ উঠলো : 'এই দশ বছর ধরেই প্রায় পারছে না। মাঝে-মাঝে আসে, কখনো-কখনো খরচ দিয়ে যায়। তাই দিয়ে চলে না সব দিন। সেই বা কী করবে বলুন, দিন-কে-দিন তার অবস্থা যাচ্ছে পড়ে, কী করেই বা দেবে! তাই রাগ করতে পারিনে; তবু ধরে আছি আঁকড়ে। কিন্তু আর পারছি না বাবু, চেয়ে দেখছেন তো এই ঘরের চেহারা, আর আমার এই জামা-কাপড়।' বলে মঙ্গলা তার বুকের আঁচলটা বিস্তৃত করে ধরলো।

আঁচলটাতে প্রকাণ্ড একটা ফালা আর তার গায়ের জামাটা একটা থলে না বালিশের অড় বোঝা দায়।

'জামা-কাপড়ে কিছু আসে যায় না, বাবু। শীতে বিছানা নেই, তাও সইতে পারি। কিন্তু সেঁকা রুটি আর দাঁত দিয়ে ছিঁড়তে পারিনে।'

'ভাত জোটে না নাকি তোমার?'

'প্রায়ই জোটে না। বাড়িওলা পয়সা দিলে তো জুটবে। কদিন ধরে এদিকে তার দেখা নেই। মা তাই তার উপর ভীষণ চটে আছে কদিন থেকে। পোড়ামুখো মিন্সে সেদিন মা আপনাকে বলেনি বাবু, বলেছিলো ঐ বাড়িওলাকে। কিন্তু তাকে গাল দিয়ে লাভ কী বলুন। আমি তো জানি তাকে। পয়সা কিছু জোগাড় করতে পারলেই সে দিয়ে যাবে আমাদের। পারছে না বলেই আসছে না। আমাদের কষ্টে কি তার সুখ?'

'তোমার মা কোথায়?'

'আর বলবেন না। বুড়ো মাকে লাগিয়েছি ঝি-গিরির কাজে। বাসন মাজতে গেছে বাবুদের বাড়িতে। রাতের পাট তুলে ঘরে ফিরতে প্রায় এগারোটা। এই বাঘাটে শীত!'

'তুমি নিজে কোনো কাজ করো না কেন? ও, হ্যাঁ, হিরুর খাটালেই তো খাটো বললে।'

'সে তো তার বকেয়া বাড়িভাড়া শুধবার জন্যে। নইলে, বাড়িওলার অমত ছিল না, দু-দুবার আমিও গিয়েছিলাম ঝি-গিরি করতে। দুটোই বড়োলোকের বাড়ি। প্রথম বাড়িতে বাবুর বড়ো ছেলে পিছু নিলে, দ্বিতীয় বাড়িতে বাবু নিজে ধরলেন আঁচল চেপে। খেংরে মুখ ভেঙে দিতে পারলাম না, এই দুঃখ। আর কোনো দিন মাড়াইনি ও নরকের রাস্তা। মা বলে, লেগে থাকলে হিল্লে হয়ে যেত এত দিনে। দরকার নেই আমার অমন হিল্লে হওয়ায়। যার কোলে আছি, তার কোলেই আছি, তা

আমার কাঁটাই হোক আর তুলোই হোক! আমার স্বামী যদি মানুষ হতো, তবে তার কোলই আমি ছাড়তাম নাকি জীবনে?'

এমন বিপদে পড়বে রেবতী কল্পনাও করতে পারেনি। কোথায় ফুর্তি করতে আসা, তা না, দুঃখের ঢোলসমুদ্র। কিন্তু অসহিষ্ণু হলে মঙ্গলা ক্ষমা করবে না। মঙ্গলাকে পেতে হলে দুঃখী বলেই পেতে হবে।

ইতিহাসটা ছোটো। তেরো বছর বয়সে বিয়ে হয় মঙ্গলার, স্বামী বদ্ধ পাগল। কে নাকি বলেছিলো বিয়ে করলে পাগলামি সেরে যাবে; আসলে দাঁও মেরেছিলো মঙ্গলার বাপ। দুবছর অপেক্ষা করেও যখন পাগলামি ভালো হলো না তখন শাশুড়ির অসুখে সেবা করবার জন্যে শাশুড়ির সঙ্গে সে কলকাতায় এলো। উঠলো এসে এক টিনের চালার বস্তিতে, পড়লো এই বাড়িওলার নজরে। রাতারাতি শাশুড়ির অসুখ গেল সেরে, বাড়িওলার হাত থেকে মোটা টাকা নিয়ে সে প্রস্থান করলে।

তবু, তখনো কাঁদেনি মঙ্গলা। নিজেকে ভাবেনি অভাগিনী বলে। ভেবেছে, যতক্ষণ সে একাশ্রিতা ততক্ষণ সে কিছুতেই অসতী নয়। হোক বাড়িওলা বুড়ো, না হোক সে ঠিক মনের মতন, তবু সে-ই যখন তাকে প্রথম ছুঁলো, মঙ্গলাও তাকেই শেষ পর্যন্ত ছুঁয়ে থাকবে। তাই সে কোনো কষ্ট মনে করেনি, কোনো লোভকেই ভাবেনি লোভনীয় বলে। ভাই বিয়ে করে মাকে তাড়িয়ে দিলে, মা এলো মঙ্গলার আশ্রয়ে। নিজের দশ-হাত শাড়ি পাঁচ-হাত হলো, আধ-পো চাল এক কুনকে। মা এসে দেখাতে লাগলো পর্দা-ফেলা, শিকলে-কুকুর-বাঁধা, বেড-সুইচ-জ্বালানো কোটা ঘরের স্বপ্ন, কিন্তু মঙ্গলা টললো না। তার লণ্ঠন নেমে আসুক কুপিতে, তোষকের তন্তুমাত্রও আর না থাক, শীতে তার এই ছেঁড়া আঁচলই সম্বল হোক, সে ছাড়বে না বাড়িওলাকে। সে থাকবে একগম্যা। বাড়িওলার বাড়ি-ঘর যাক, কিন্তু সে আছে।

'কিন্তু বাড়িওলাই বা তোমাকে ছাড়েনি কেন এতদিন? তোমার এত দুঃখ দেখেও?' রেবতী টিপ্পনী কাটলো : 'তার এ কী ব্যবহার!'

'কী বলবো বলুন। হয়তো অভ্যেস। বুড়ো বয়সে হয়তো একটু সেবা পাবার লোভ। হয়তো বা ভালোবাসা।' কথাটা বলে নিজেকেই নিজে শাসিয়ে উঠলো মঙ্গলা : 'কিন্তু এই শুকনো ভালোবাসায় কী হবে বলুন! তিন দিন ধরে ভাতের মুখ দেখিনি। আজ দিন পাঁচেক তার দেখা নেই।'

যাক, রাত এবার পোহালো মঙ্গলার। রেবতী যখন এসে পড়েছে তখন আর ভাবনা নেই, তার মাটির দেয়াল আয়না হয়ে উঠবে আগাগোড়া। কিন্তু এদিকে যে রাত হয়ে যাচ্ছে রেবতীর।

'শুনুন।' রেবতীর উদ্ধত হাত সরিয়ে দিয়ে মঙ্গলা বললে, 'কিন্তু এক সর্ত। আপনি আমার একার না হোন, কিছু আসে যায় না আমার, কিন্তু আমি আপনার একার থাকবো—এইটেই আমার একমাত্র কড়ার। নইলে—'

পাছে আবার কান্নায় উছলে ওঠে, রেবতী অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললে, 'নিশ্চয়। আমি তোমার জন্যে আলাদা ঘর ভাড়া নেব, লেপ তোষক খাট তোরঙ্গ আয়না আলমারি আস্তে-আস্তে সব এনে জড়ো করবো তোমার ঘরে, নিজে আসি আর না আসি, তোমার মাসোয়ারা ঠিক আসবে।'

মঙ্গলা তবুও ঢিল দিলে না। বললে, 'দেখুন, অত-শত আমি চাইনে। থাকবার ঘর, শোবার সামান্য বিছানা, পরবার অল্প কাপড়, পেট ভরে খাবার চারটি ভাত, আর আমি একজনের, আমি স্ত্রী, আমার একদিন বিয়ে হয়েছিলো, আমি হাতে শাঁখা পরেছিলাম—তা বোঝবার ও বিশ্বাস করবার মতো একটা অবস্থা। সেইটুকুই যদি আমি পাই, তা হলে আমায় পায় কে? তা না হলে বাড়িওলাকে লুকিয়ে এমনি ছুটোও তো আনতে পারি লোক, কে বা তাকে বলতে আসছে বলুন—কিন্তু তা হলে আমার শাঁখার যে কোনো মান থাকে না।'

'তোমাকে যদি আলাদা বাড়িতে নিয়ে যাই এখান থেকে, তবে খুব চটবে তোমার বাড়িওলা ?'

'চটলে আর উপায় কী বলুন। এমনি ভাবে পেট চটিয়ে কদিন আর বাঁচতে পারে মানুষে ? আপনি যখন থাকবেন কায়েম হয়ে তখন আর আমার ভয় কী ? এ পাড়া থেকে উঠে যাবো, বুড়ো হদিসই পাবে না। কি, রাখবেন তো ঠিক ?'

'আজ থেকেই। আজই তোমাকে টাকা দিয়ে যাব আগাড়ি।'

'কবে বাড়ি বদলাবেন ?'

'কাল না হলে পশু´। একটা দিন ঘুরে-ঘুরে দেখি।'

দরজায় কার ঘা পড়লো। সংক্ষিপ্ত, সন্দিগ্ধ। এলো বুঝি বাড়িওলা। গা কাঁটা দিয়ে উঠলো রেবতীর। নিচু গলায় বললে, 'বাড়িওলা বুঝি ?'

'না, রাত নটার পর সে আসে না ! এ মা এসেছে।'

কাপড়ের গোঁজ সরিয়ে দরজা খুলে দিল মঙ্গলা ! বুড়ি দেখলে রেবতীকে, চিনলে ও সমর্থন করলে। দামী শাল, সোনার বোতাম, কব্জির ঘড়ি, সর্বোপরি সম্ভ্রান্ত চেহারা আনলে এই সমর্থনের আনন্দ। নির্দন্ত মুখে হেসে বললে, 'মেয়ের সুমতি হলো এত দিনে।'

এ আরেক জঞ্জাল—রেবতী মনে করলো। বললে, 'তোমার মা থাকবে কোথায় ?'

'কেন, আমি যেখানে থাকবো। ঘর না হোক দাবায়। একটা মাদুর হলেই মা শুয়ে কাটিয়ে দিতে পারে।'

'কিন্তু এখানে তোমার দাওয়া কোথায় ?'

'এখানে ? এখানে মা বাইরে বসে কাটিয়ে দিতে পারবে।'

'এই পচা শীতের মধ্যে ? ঐ বুড়ো মানুষ ?' নিমেষে কেমন জুড়িয়ে গেল রেবতী।

'নইলে আর উপায় কী বলুন।' মঙ্গলা কুণ্ঠিতের মতো বললে।

'আচ্ছা, আজ থাক। পশু এেকবারে ঘর ঠিক করে তোমাদের নিয়ে যাব। দুখানা ঘর, আলাদা। একটা মা'র, একটা তোমার।' রেবতী নেমে পড়লো তক্তপোষ থেকে।

'আপনি আর আসবেন না!'

'আসবো বলেই চলে যাচ্ছি অমনি। হবেই আসতে।'

'তা হলে আপনার গায়ের শালখানা রেখে যান।'

'বিশ্বাস করো ঠিক আসবো।'

'বড্ড শীত করে রাত্তিরে, গায়ে দেবার কিছু নেই—'

'তোমার জন্যে লেপ নিয়ে আসবো কাল। সত্যি বলছি।'

'পশু ঘর, কাল লেপ, আজ কী?' মঙ্গলা ঘোলাটে চোখে হাসলো: 'আজ কি স্বপ্ন?'

'আজ টাকা।' রেবতী তার মনিব্যাগের হাঁ খুললো।

আশাতীত টাকা। গণনার মধ্যে আনতে পারেনি মঙ্গলা। অভিভূতের মতো নিজের থেকেই সে রেবতীর হাত চেপে ধরলো, বললে, 'আমি আর কিছু চাই না, আমি তোমার, আমি একজনের—শুধু এইটুকুই বুঝতে চাই। শুধু এইটুকুই।'

'কি লো, টোপ গেলে না নাকি?' হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতেই রেবতী শুনলো ক'টা সঞ্চরমান মেয়ে মঙ্গলার উপর মুখিয়ে উঠেছে।

মঙ্গলার মা অদূরের শান-বাঁধানো রোয়াকে বসে দুহাঁটুর মধ্যে মুখ ঢেকে কাশছিলো, কাশি না থামতেই উঠলো খেঁকিয়ে: 'টোপ গেলে না গেলে তোদের কি লা শতেকখোয়ারি?'

মেয়েগুলোও কদর্যতর ভাষায় খনখনিয়ে উঠলো। এক কথায়, বাড়িওলাকে তারা বলে দেবে। তাকে লুকিয়ে তারি ঘরে এ কারবার তারা বরদাস্ত করতে পারবে না। একনিষ্ঠার মাহাত্ম্য কীর্তন করবে তারা।

উত্তরে মঙ্গলা কী বলে শোনবার জন্যে দাঁড়ালো রেবতী। এদের নিকটে থেকে ছড়ার টুকরোই শুধু সে শেখেনি, শিখেছে কোঁদল করার কায়দা। দু-একটা বিশ্রী বুকনিও বেরিয়ে আসছে থেকে-থেকে। 'তোদের তাতে গা টাটায় কেন লা মুখপুড়িরা? ছোঁ মেরে তোদের শিকার কেড়ে নিয়েছি, তাই না? কী আছে তোদের যে লোক আসবে তোদের কাছে? ঐ তো সব কেলে-হাঁড়ির চেহারা, কিষ্কিন্ধ্যা-ফেরৎ, তায় আবার অত ঠাট কিসের শুনি? গলি থেকে রাস্তা আর রাস্তা থেকে গলি—সারা রাত তো চটি ফটফটিয়ে বেড়াস, জোটে কী অদেষ্টে? মুটে-মজুর, মেথর-মুদ্দোফরাস—তাই অমন হাডাইডোমাই করছিস। তোদের বাড়া ভাতে ছাই দিয়ে রাজপুত্তুর এলো আমার ঘরে, চোখ চেয়ে আর সইতে পারছিস না। বলে দিস বাড়িওলাকে—আমি তোয়াক্কা রাখি নাকি তার?'

একা মঙ্গলা সেই বাহিনীর সঙ্গে পেরে উঠবে কেন? এ-পাড়ার নীতি-শাস্ত্রে এত বড়ো অন্যায়, এত বড়ো পাপ কেউ ভাবতেও পারে না। যে পাঁচজনের সামগ্রী তাকে মঙ্গলা কী বলে একা অধিকার করবে. মঙ্গলা যখন একা একজনের? রাজুবালার লোক যদি সরযূ না নিতে পারে, তবে সরযূ-রাজুবালার লোককে মঙ্গলা নেয় কোন স্বত্বে? ছুটো থাকতো মঙ্গলা, কেউ কথাটি বলতো না। সে ঘটিও কিনবে গঙ্গাস্নানও করবে, চলবে না তা।

গণতন্ত্র জয়ী হলো। রেবতী পালিয়ে গেল গলি ছেড়ে।

দুদিন পর এলো বাড়িওলা, হাতে ঠোঙায় করে কিছু খাবার, রংচটা ফেঁসে-যাওয়া র‍্যাপার ঢাকা দিয়ে। অনেক দিন পর কিছু খাওয়াবে আজ মঙ্গলাকে। ট্যাঁকে করে একটা সিকিও সে নিয়ে এসেছে বাঁচিয়ে।

ঘরে ঢুকে একটা মমতার ভাব করতেই মঙ্গলা অশ্রুঘন কণ্ঠে বললে, 'আমাকে ছুঁয়ো না, আমি নষ্ট হয়ে গেছি।'

বিমূঢ়ের মতো এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো বাড়িওলা। কবে যে মঙ্গলা অনষ্ট ছিল তাই যেন সে ভাবতে লাগলো।

মঙ্গলার আর রা নেই। মুখ গোঁজ করে বসে রইলো। খাবারের ঠোঙাটা নিলও না হাত বাড়িয়ে।

কী ব্যাপার—পাঁচ কাহন করে বুঝিয়ে বললে প্রতিবেশিনীরা। বাঁধা থেকেও কিনা ফুড়ুকফাঁই। ঘোমটার নিচে থেকে কিনা উঁকিঝুঁকি। এক মুর্গির ক'বার জবাই হবে জিগগেস করি? এ কী নেমকহারামি! বছর দশেক ধরে আছে এই বাড়িওলা—কই, কখনো কেউ দেখেনি তো আর কারু দিকে নজর দিতে! তাব কিনা এই প্রতিদান! এঁটো পাত যে কখনো স্বর্গে যায় না, তা কে না জানে?

একটা প্রতিবাদ করলো না মঙ্গলা। দুরপনেয় কলঙ্কের ভার মাথায় করে বসে রইলো নিঃশব্দে। মুখের কথায় একটা ক্ষমা পর্যন্ত চাইলো না।

রাত নটার কাছাকাছি আসতেই বাড়িওলা অভ্যেস মতো চলে গেল র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে। বোধ করি এত দিনে একটা পাকাপাকি ছুতো পেল মঙ্গলাকে ছেড়ে দেবার। ট্যাঁকের সিকিটা দিয়ে মোড়ের পানের দোকান থেকে এত দিনে বিড়ি নয়—সিগারেট কিনলে।

মঙ্গলা তাই এখন জনতায় নেমে এসেছে—রাধারাণীর পাশেই তার ঘর। খাট-পালঙ বা তোষক-জাজিম হয়নি বটে, কিন্তু হয়েছে একটি বিছানা, বাঁদিপোতার খাটো লেপ একখানা। তক্তপোষের এক পাশে দেয়াল ঘেঁসে একটি স্টিলের ট্রাঙ্ক, মস্ত বড়ো ফুল-আঁকা টিনের স্যুটকেশ। কাঠের বেঞ্চিতে গোটা কয়েক বাসন—ঠিলি, পিকদানি, ডাবোর, থালা-বাটি ক'টি, সব ঝকঝক করছে। ক্যালেণ্ডারের চীনে মেয়ের ছবি টাঙানো দেয়ালে। ভাঁজ-করা আয়না হয়েছে একখানা, বেঞ্চির নিচে কাগজের বাক্সের ডালায় খেলো ক'টি প্রসাধনের কৌটা। ভাত আর তার রোজকার

মতো কিনে খেতে হয় না। ভিতরের দাওয়ার এক পাশে তোলা উম্নুনে তার রান্নার জায়গা হয়েছে। দশ দিনেই অনেক উন্নতি হয়েছে মঙ্গলার। অনেক উন্নতি হয়েছে। চটি ফটফটিয়ে পাইচারি করে সে চাঁদের আলোয়। রাজুবালার সঙ্গে তার এখন গলায়-গলায় ভাব।

শুধু হাতের শাঁখা দুগাছি আর নেই। তার বদলে এখন কেমিকেলের চুড়ি ঝলমল করছে।





সহমরণ

ধন্য ধন্য রব পড়ে গেল। গ্রামের মেয়েরা সবাই দলে-দলে দেখতে এলো ভবানীকে।

দুবছর আগেও একবার এসেছিলো, ক্ষিতীশ যেদিন ভবানীকে নিয়ে আসে বিয়ে করে। কিন্তু সেদিন আর আজ—কত তফাৎ!

সেদিন সবাই মুখ বেঁকিয়েছিলো মনে-মনে। এক গা বয়েস, পাশ দিয়েছে নাকি একটা, মাথার কাপড়ে কপাল পর্যন্ত ঢাকা পড়েনি, পায়ে খুর-তোলা জুতো—শব্দে যেন পাথর ভাঙে। এ কেমন ধারা নতুন বৌ গা। কপালে নেই, চুলের রেখায় অতিকষ্টে একটু সিঁদুর আঁকা বাঁকা সিঁথিতে। দুদিন যেতে না যেতেই বিধবা শাশুড়ির আঁচলের থেকে চাবির রিং নাকি খুলে নিয়েছে। সকাল আটটার আগে নাকি ঘুম ভাঙে না, আর আঁধার বা জোছনা, রাত একটু ঘনিয়ে এলেই ক্ষিতীশকে নিয়ে নাকি হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে নদীর বাঁধের উপর দিয়ে বেড়িয়ে বেড়ায়। রাস্তার উপরেই নাকি টর্চের আলোতে আয়নায় মুখ দেখে ঠোঁটে রঙ ঘষে।

বড়ো রোগা ছেলে তাঁর এই ক্ষিতীশ। ক্ষিতীশের মা তাই বৌয়ের বিরুদ্ধে কোনো নালিশই সহ্য করতে পারেন না। কত পূজো-আচ্চা, কত হত্যে মানত করে ক্ষিতীশকে তিনি বাঁচিয়ে রেখেছেন, তাঁর একমাত্র ক্ষিতীশ। হাতে-গলায় তার বায়ান্নটা মাদুলি ছিল, বিধিনিষেধের দড়ি দিয়ে আষ্টে-পৃষ্টে বাঁধা। তবেই না এত বড়ো করতে পেরেছেন তিনি ক্ষিতীশকে। নইলে কে ভাবতে পেরেছিলো তাঁর সেই ক্ষিতীশ দুপায়ে দাঁড়াবে, চাকরি করে টাকা ঘরে আনবে, বিয়ে করবে সোমত্থ বয়সের জলজ্যান্ত মেয়ে। সেই ক্ষিতীশের ঘরে নাতি-নাতনি আসবে পালে-পালে—একটা কোলে, একটা কাঁধে—আর কী-ই বা তাঁর চাইবার আছে সংসারে! সত্যি, কিছু চানওনি তিনি—ঠিকুজি দেখে জ্যোতিষী বলেছিলো রাজযোটক হয়েছে, তাইতেই তিনি খুশি। বৌয়ের বিরুদ্ধে যে যাই বলুক, ক্ষিতীশের মা'র হাতে আছে রঙের টেক্কা—রাজযোটক।

পাশের বাড়ির বাগচি-গিন্নি মুখ ঘুরিয়ে বলেছিলো : 'রাজ্য-টক না হয়ে গেলে হয়।'

আজ সকালবেলা ক্ষিতীশের মা'র কণ্ঠে গগনবিদারণ চীৎকার শুনে প্রথমে সেই কথাটাই মনে হয়েছিলো বাগচি-গিন্নির : 'কই, এ যে শেষ পর্যন্ত রাজ্য-টকই হয়ে গেল দেখছি।'

কিন্তু যে যাই বলো, সবারই আগে এই বাগচি-গিন্নিই এলো ভবানীকে বুকে জড়াতে ; বললে, 'তুই সাক্ষাৎ সাবিত্রী মা, আমরা তোকে চিনতে পারিনি কেউ।'

প্রথমটা ভবানী কিছুই বুঝতে পারেনি, যেমন শূন্য চোখে চেয়ে ছিল তেমনি শূন্য চোখেই চেয়ে রইলো ; কেউ তার কপাল ভরে লেপে দিতে লাগলো সিঁদুর, কেউ পায়ের পাতা ভরে আলতা। আবার তারি অংশ নিতে লাগলো কৌটো করে। যারা কুমারী তারা তাকে প্রণাম করতে লাগলো পা ছুঁয়ে।

আগাগোড়া কিছুই বুঝতে পারেনি ভবানী। দুবছরের মধ্যেই সে একেবারে শাদা, শূন্য হয়ে যাবে কে ভাবতে পারতো ? এত সেবা এত প্রার্থনা, কেন সব ব্যর্থ হয়ে যাবে ? কী সে অপরাধ করেছে জিগগেস করি ? শেষ রাতের দিকে ক্ষিতীশ একবার অসহায় চোখে তাকিয়েছিলো ভবানীর দিকে, সে-বিস্তীর্ণ শূন্যদৃষ্টির দিকে চেয়ে সবাইকে শুনিয়ে ভবানী কেঁদে উঠেছিলো : 'কী আমি অপরাধ করেছি জিগগেস করি? কেন তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে ?'

আর সে কাঁদতে পারেনি এতটুকু। পরিচিত রোদের দিকে তাকিয়ে ভেবেছে, এ তার কী হলো ? সব ঠিক আছে তো সে বদলে গেল কেন ? এখন সে যাবে কোথায়, করবে কী ? এরি মধ্যে মনে-মনে হিসেব করে রেখেছে ভবানী। পঁচাত্তর টাকা মাইনের কেরানি, মোটে দুহাজার টাকার ইনসিওর করেছে, ভাগ্যিস বুদ্ধি করে গোড়াতেই সেটা স্যাসাইন

করে রেখেছিলো তার নামে। টাকাটা তুলে নিতে হয়তো বেগ পেতে হবে না। আর কিছু গয়না, হিসেব করে দেখলো, খুচরোখাচরা নিয়ে ভরি কুড়ি। আর কাঁচা বত্রিশটা টাকা এ কয়দিনের সংসার খরচ থেকে বাঁচানো। এত দুঃখের মধ্যেও ভবানীর হাসি পেলো। এতে তার কতদিন চলবে—তার বয়েস মোটে এখন বাইশ। যে-পথ দিয়ে শ্মশানযাত্রীরা গেছে ভবানী একবার সে-পথের দিকে চোখ মেললো। না, কোনো কিছুতেই সে ভয় পাবে না। সে নিজের পায়ে দাঁড়াবে। যে পরকে ভর করে দাঁড়ায় সেই তো অসহায়। এখানেই নিশ্চয় আর ভবানী থাকবে না—এই জঙ্গুলে গ্রামে, শাশুড়ির মড়াকান্নার মধ্যে। গোড়াতে অবশ্যি তাকে যেতে হবে বগুড়ায় তার বাপের কাছে। সেখান থেকে কালক্রমে কলকাতায়। হয় কোথাও একটা মাস্টারি, নয় হাসপাতালের নার্স—নিজেকে সে কখনোই বয়ে যেতে দেবে না। আর কাকেই বা বলে বয়ে যাওয়া ! সুবিধে যদি সে পায় ফিল্‌ম্‌-স্টুডিয়োতে ঢুকতেও তার আপত্তি নেই কি, বরং আগ্রহ আছে। একেকজন অভিনেত্রী কেমন মাটকোঠা থেকে চারতলা বাড়িতে গিয়ে উঠেছে। আর এ-সব সুবিধে যদি সে না-ই পায়, সোজা সে চলে যাবে কলেজে, ধাপে-ধাপে যত উঁচুয় খুশি। সে এখন মুক্ত, একেবারে মূলচ্যুত। এত দুঃখের মধ্যে এটাই শুধু ভবানীর আশা—প্রায় একটা নেশার মতো—এই নির্বারিত মুক্তির চেতনা। আর কেউ কিছু তাকে বলতে আসবে না, ধরতে আসবে না, আর কারুর মুখ রাখবার তার কথা নেই। সে এখন যা খুশি করতে পারে, যেখানে খুশি চলে যেতে পারে, না কেঁদে খিলখিল করে হেসে উঠতেও পারে বা। মরতে বসলে কেউ মানা করবে না মরতে। সে এখন এত স্বাধীন।

'কাঁদো, কাঁদো একবার তুমি বৌ। অমন পাথর হয়ে থেকো না। দেখছ না সবাই কেমন কাঁদছে। কেঁদে-কেঁদে নিজেকে হালকা করো। নইলে ফিট হয়ে পড়ে যাবে যে !' প্রতিবেশিনী অনেকে এসে অনুরোধ করেছিলো

ভবানীকে। ভবানী তবুও কাঁদতে পারেনি, শূন্য চোখে চেয়ে-চেয়ে ভাবছিলো, কলকাতায় পিসেমশাইর বাড়িতে যদি তার আশ্রয় না-ই হয় সে মেয়েদের এমনি কোনো হস্টেলে গিয়েই উঠবে। ভাবছিলো, বিজয় থাকলে আজ আর কোনো কথা ছিল না।

'তখনই জানি মা আমার কেন কাঁদে নি।' বাগচি-গিন্নি ভবানীকে নিবিডতরো স্নেহে আকর্ষণ করলেন। 'কেনই বা কাঁদবে বলো? মার আমার কী হয়েছে যে কাঁদবে?'

'মা যে দেবী, জানতো আগে থেকে। তাই তো চোখের জল ফেলে অমঙ্গল ডেকে আনেনি।' কে আরেক জন বললে।

'তোমার মাহাত্ম্য আমরা বুঝতে পারিনি, মা।' গয়লাদের বৌ এসে লুটিয়ে পডলো পায়ের উপর।

শ্মশান থেকে খাট এল ফিরে।

উঠোনেই প্রথম নামাতে গিয়েছিলো, কিন্তু ক্ষিতীশ বললে, 'না, ঘরে নিয়ে চলো। আমি এখন অনেক ভালো আছি।'

'আর কাঁদছ কী ক্ষিতুর মা? ক্ষিতু যে তোমার বেঁচে আছে, ভালো আছে: মিথ্যে কথা, ও যে মরেনি একেবারেই। চেয়ে দেখ, সশরীরে ফিরে এসেছে তোমার ক্ষিতু।'

ক্ষিতীশের মা মূঢ়ের মতো তাকিয়ে রইলেন। শোকের মধ্যে হঠাৎ ছেদ পড়ে যাওয়াতে টের পেলেন বাড়ির মধ্যে অনেক উৎসুক লোকের ভিড়, অনেক কৌতূহলী কথাবার্তা। তখনকার ভিড় ছিল স্তব্ধ ক্ষিতীশ যখন যায়, এখনকারটা আশ্চর্য রকম মুখরিত। ক্ষিতীশ কি সত্যিই ফিরে এলো না কি তবে? এ কখনো সম্ভব হতে পারে? মরা ছেলে কখনো ফিরে আসে তার মা'র কোলে?

কিন্তু নিজের চোখকে অবিশ্বাস করবেন কি-করে? শুকনো দড়ির খাট থেকে ক্ষিতীশকে তখন তুলে আনা হয়েছে তার বিয়ের খাটে, নতুন

বিছানায়। চিং হয়ে শুয়ে আছে ক্ষিতীশ, আর, সত্যি, নিশ্বাস পড়ছে তার ঘন-ঘন, বুক ওঠা-নামা করছে তালে-তালে। গা-হাত-পা গরম। আনন্দে, আনন্দের আঘাতে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন ক্ষিতীশের মা।

রোগীর নাড়ী ধরে স্তব্ধ মুখে বসেছিলেন কবিরাজমশাই, ক্ষিতীশের মা তাঁর প্রতি হঠাৎ মুখিয়ে উঠলেন : 'আপনারা কেমন ধারা লোক জিগগেস করি ? প্রাণ আছে, অথচ বলেছিলেন কি না নেই ? বাছাকে আমার পাঠিয়ে দিলেন বাড়ির বাইরে ? চলে যান, চলে যান আপনারা আমার বাড়ি ছেড়ে, আপনাদের কাউকে আর চিকিৎসা করতে হবে না। যত সব ডাকাত আর বাটপাড। ছোটোলোক।'

মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে বসে, বারান্দায়, ভবানী ম্লানমুখে একটু হাসলো। এ কি, ক্ষিতীশ ফিরে এসেছে শুনে মা-ও হতাশ হয়েছেন নাকি ?

কবিরাজমশাই একটুও চঞ্চল হলেন না, মৃদু রেখায় হেসে বললেন, 'আমাদের কথা যে মিথ্যা প্রতিপন্ন হলো এটাই তো মঙ্গল। আপনিই বলুন, মঙ্গল নয় ? নইলে, আমরা যে বলেছিলুম; ও আর নেই, সেটা সত্য হলেই কি ভালো হতো ?' কবিরাজমশাই গভীরতর মনোযোগে নাড়ী দেখতে লাগলেন : 'নাড়ীর অবস্থা তো এখন ভালোই মনে হচ্ছে। কিন্তু ভাবছি, অসাধ্যসাধন হলো কি-করে ? এত লোকের দেখা, এতক্ষণ ধরে দেখা সব কি-করে ভুল হয়ে গেল ?'

মেয়ে-পুরুষ সবাই একবাক্যে বলে উঠলো : 'এ শুধু স্ত্রীর জোরে, স্ত্রীর সতীত্বের জোরে।'

'তাতে আর সন্দেহ কী।' কবিরাজমশাই গম্ভীরমুখে সায় দিলেন : 'তবু, ব্যাপারটা কেমন যেন অদ্ভুত, অলৌকিক বলে মনে হচ্ছে।'

হোমিওপ্যাথির বুড়ো ডাক্তার রোগীর বুকে স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে চুপ করে বসে ছিলো অনেকক্ষণ। সে এতক্ষণে সচেতন হয়ে বললে, 'সত্যি— আশ্চর্য।'

'রেখে দিন মশাই।' পরুষকণ্ঠে কে একজন উঠলো বিদ্রূপ করে: 'যত সব হাতুড়ের সর্দার। চিকিৎসার আপনারা বোঝেন কী? আর যা বোঝেন না, বিদ্যেয় কুলোয় না, বলে বসেন, আশ্চর্য, অদ্ভুত। সূর্য যতক্ষণ আছে ততক্ষণ যে রাত নয় এটার মধ্যে আশ্চর্য হবার আছে কী? এটা গ্রহণের অন্ধকার না সত্যিকারের রাত এটুকু যদি বুঝতে না পারেন তবে হাতুড়ি ছেড়ে দিয়ে হাল চালান গিয়ে।'

'কেন, আপনাদের এম-বিও তো দেখেছিলো একে। তার তো খুব দিগগজ বলে নাম—কই, সে ধরতে পারলে না কেন?' বুড়ো ডাক্তার খাপ্পা হয়ে উঠলো।

'সব চোরে-চোরে মাসতুতো ভাই।'

অনেকেই হেসে উঠলো কথা শুনে, এবং সকলেই লক্ষ্য করলে, ক্ষিতীশও মৃদু-মৃদু হাসছে।

সত্যি, ভাবতে গেলে যেন বিশ্বাস হয় না। কাল সকাল থেকে ক্ষিতীশের নাকের ডগা ছিল বেঁকে, পর্শু থেকে সে বিছানা আঁচড়াচ্ছিলো। কে না ভেবেছিলো যে সে আর বেশিক্ষণ নেই। বারো ঘণ্টারও বেশি তার গলার মধ্যে ঘড-ঘড়ে আওয়াজ, তারও আগে থেকে, থেকে-থেকে হিক্কা। কনুই আর হাঁটু পর্যন্ত হাত-পা ঠাণ্ডা। কে সন্দেহ করতে পেরেছিলো এ সমস্ত লক্ষণকে? তার পর আজ সূর্য ওঠার সঙ্গে-সঙ্গেই নাড়ী গেল ছেড়ে, চোয়াল পড়লো ভেঙে, সমস্ত গা বরফের মতো হিম হয়ে গেল। ডাক্তার-কবিরাজেরা বোকা মুখে চলে গেল একে-একে। কত কান্নাকাটি, কত হুলুস্থল, কত আছাড়ি-পিছাড়ি, তবু ক্ষিতীশ এতটুকু নড়লো না, টুঁ শব্দ করলে না, হাসলোও না একটু মৃদু-মৃদু। যেমনি অনড় তেমনি অনড় হয়েই পড়ে রইলো। মৃত্যুকে কি কখনো কারু ভুল হয়? উঠোনে তাকে শুইয়ে রাখা হয়েছিলো প্রায় ঘণ্টা চারেক। প্রথমতো কাঠ জোগাড় করতেই খুব দেরি হয়ে গিয়েছিলো। এ-বাড়ি ও-বাড়ি করে

কাঠ সংগ্রহ করতে কম ঘোরাঘুরি হয়নি। তার পর ভবানী বলেছিলো, কিছু ফুল। এ জঙ্গলে আবার ফুল কোথায়, কিন্তু বৌটার মুখের দিকে চেয়ে আপত্তি করতেও মায়া করে। শীতকালে এ অঞ্চলে সর্ষেফুলের উপরে ফুল নেই, আর গাঁদাও যা দু-এক বাড়িতে আছে বেড়া ভেঙে চুরি না করলে পাওয়া যায় না। তবু অতি কষ্টে অনেক দেরি করে কয়েকটা পাতিগাঁদা কে যোগাড় করে এনেছিলো। ক্রমে-ক্রমে ছায়া সরে গিয়ে রোদ এসে পড়লো উঠোনে মৃতদেহের উপর, দু-একটা মাছিও ঘুরে-ঘুরে বসতে লাগলো মুখে-চোখে। তবুও ক্ষিতীশ নিঃসাড়, এততেও সে হাস্যহীন।

শবযাত্রা শুরু হয় প্রায় এগারোটায়। যাত্রার আগে ক্ষিতীশকে যখন উঠোনের তক্তপোষ থেকে দড়ির খাটে নামানো হয় তখন উৎসাহী কয়েকজন ছোকরা দেহটাকে খাটের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে নিয়েছিলো। আশ্চর্য, তখনো ক্ষিতীশ এতটুকু গাঁইগুঁই করেনি। কোমরে-গামছা-বাঁধা গেঞ্জি-গায়ে উৎসাহী ছোকরারা হরিবোল বলতে কম চীৎকার করেনি, কিন্তু ক্ষিতীশের ঘুমে এতটুকু আঁচড় পড়েনি তখনো।

নদীর ঢালের নিচে চড়ার উপরে শ্মশান। শ্মশানের ঘরটির বড়ো ভগ্নদশা। এ-দল ভার পেলে ইঁট চুরি করবে আর ও-দল ভার পেলে চুন চুরি করবে, এই দলাদলিতে ঘরটির সংস্কার হচ্ছে না। তবু যা হোক ইঁটের কঙ্কাল ক'খানা এখনো কোনো রকমে দাঁড়িয়ে আছে বলে জায়গাটাকে লোকে অন্তত শ্মশান বলে চিনতে পারে।

মন্দ দূর নয় শ্মশান। কাঁধ বদলে-বদলে পৌছুতে প্রায় দুপুর গড়িয়ে গেল। খাট নামিয়ে রাখা হলো অশথ গাছের তলে, ঘরের বাইরে। উত্তুরে হাওয়া দিয়েছে কনকনে, খসখসিয়ে দু-একটা করে ঝরে পড়ছে শুকনো পাতা। চারদিকে ভাঙা হাঁড়ি, পোড়া কাঠ, ন্যাকড়ার ফালি। একটা কাক ডাকছে বসে-বসে।

হঠাৎ ক্ষিতীশ যেন একটু নড়ে উঠলো। কাছেই বসে বিড়ি ফুঁকছিলো কয়েকটা ছোকরা, প্রথমটা ঠিক ঠাহর করতে পারেনি। ভেবেছিলো হাওয়া, নিজেদেরই কারু বা শীতের কাঁপুনি। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ক্ষিতীশের গলার মধ্যে থেকে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ বেরুতে লাগলো, যেন অত্যন্ত কোনো কষ্টের আওয়াজ। হাড়ের মজ্জা পর্যন্ত শিউরে উঠেছিলো সবাই, কিন্তু কই, না, তাদের মধ্যে কেউ তো অমন শব্দ করছে না। রুদ্ধশ্বাস হয়ে শুনলো আবার তারা, প্রত্যেকটি রোমকূপকে চক্ষুষ্মান করে। কে একজন সাহস করে মৃতদেহকে স্পর্শ করলো, মুক্ত শীতের বাতাসেও গা দিব্যি গরম।

'মরেনি, মরেনি এখনো ক্ষিতীশ।' একবাক্যে সবাই উঠলো চেঁচিয়ে: 'ক্ষিতীশ আবার বেঁচে উঠেছে।' ক্ষিপ্রহাতে কেউ খুলে ফেলতে লাগলো খাটের দড়ি, মুখের বিড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কেউ ছুটে গেল অম্বিকা ডাক্তারকে ডেকে আনতে, কারা বা ধরাধরি করে খাটখানাকে টেনে নিয়ে এলো ঘরের মধ্যে।

অম্বিকা ডাক্তার আধঘণ্টার মধ্যে এসে গেল সাইকেলে। ডাক্তারের নাম কিন্তু আসলে অম্বিকা নয়, ওটা তার উপাধি। গ্রামে সেই একা এম-বি বলে, এম-বি ও একা, দুয়ে মিলে সন্ধি করে অম্বিকা হয়েছে।

এসেই তো তার চক্ষুস্থির! রাত্রে যাকে সে জবাব দিয়ে এসেছে সেই কিনা এখন পালটে জবাব দেবার জন্যে প্রস্তুত। আশ্চর্য, নাড়ী প্রায় তিড়-বিড় করছে, প্রায় ধুকধুক করছে বুক। অম্বিকা ডাক্তার তাড়াতাড়ি তার হাফ-প্যাণ্টের এক পকেট থেকে ওষুধ ও অন্য পকেট থেকে সিরিঞ্জ বের করে ক্ষিতীশের হাতে একটা ইনজেকশন করলে। মিনিট পনেরো সবাই দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলো। আস্তে-আস্তে ক্ষিতীশের কপালের একটা শিরা ফুলে উঠতে লাগলো নীল হয়ে, ঠোঁট দুটো যেন একটু ফাঁক হলো, আর চোখের পালক সরে গিয়ে দেখা দিল ভিতরের সাদার

খানিকটা। অম্বিকা ডাক্তার কালবিলম্ব না করে আরেকটা ইনজেকশন করলে।

সবাই ভেবেছিলো দেখতে-দেখতে আবার সব ঠাণ্ডা হয়ে আসবে যেমন-কে-তেমনি। আগুন নিবে যাবার পর যদিও বা কোথায় একটি স্ফুলিঙ্গের কণা দেখা যায় তার থেকে ফের নতুন অগ্নিকাণ্ডের সম্ভাবনা বিশেষ থাকে না, আপনার চেষ্টার মধ্যেই তার ক্ষয় হয়। সন্ধ্যাকালের রংটা রাত্রিকেই সূচনা করে। তেমনি এও হয়তো নেহাৎ একটু আড়মোড়া ভেঙে একআধটা হাই তুলে, একটু বা নাক ডাকিয়ে নিয়ে চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়বে এখুনি। তারি জন্যে সবাই প্রতীক্ষা করছিলো, একটা আরম্ভের প্রত্যাশিত পরিণতির জন্যে। কিন্তু তৃতীয় ইনজেকশনের পর ক্ষিতীশ স্পষ্ট চোখ চাইলো, আর আটচল্লিশ ঘণ্টারও উপর যে কণ্ঠ রুদ্ধ ছিল তা দিব্যি পরিষ্কার করে সে বললে, 'এ কী, আমি কোথায়?'

দলের মধ্যে যারা মাঝে-মাঝে পরকালের কথা ভেবে থাকে তারা নিচু গলায় বলে উঠলো: 'হরি বোল। হরি বোল।'

তবু কেউ যেন তক্ষুনি মনস্থির করতে পারলো না। এ ওর দিকে শুধু চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো। কাঠ নামানো রয়েছে, বাঁশ আর কলসি, শকুন একটা পাখা ঝাপটাচ্ছে ডালে বসে, এতক্ষণে প্রায় অর্ধেক পুড়ে যাবার কথা—কিন্তু এ কী রসিকতা! তাই তখনো তারা ভাবছিলো কী করা যায়।

ক্ষিতীশই দ্বিধার নিরসন করলো। বললে, 'আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো। ভবানীর কাছে।'

এর উপর আর কথা চলে না। অম্বিকা ডাক্তারও বললে, 'হ্যাঁ, বাড়িতেই ফিরিয়ে নিয়ে যান। ছোকরার আয়ু আরো আছে কিছু দিন। আপনারা এগোন, আমি আসছি একটু ঘুরে। চিকিৎসার এখুনি আরো বেশি দরকার।'

এবার আর কাঁধে করে নয়, খাটের নিচে দিয়ে লম্বা বাঁশ বেঁধে নিয়ে হাতে ঝুলিয়ে বয়ে নিয়ে চললো ক্ষিতীশকে। যাবার বেলায় যেমন ছিল হৈ-চৈ ফেরবার বেলায় তেমনি স্তব্ধতা, প্রায় বিষাদের কাছাকাছি। শ্মশানে পুড়িয়ে এলেও যেন এদেরকে এত ম্রিয়মান দেখাত না।

উঠোনেই নামাবে না ঘরে তুলবে আবার দ্বিধা উপস্থিত হয়েছিলো বোধ-হয়, কিন্তু ক্ষিতীশই নির্দেশ দিলে: 'না, ঘরে নিয়ে চলো। আমি এখন অনেক ভালো আছি।'

শীতের বেলা তখন পড়ো-পড়ো। শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশীর চাঁদ ফ্যাকাশে হয়ে আছে পূব আকাশে।

ভবানীকে নিয়ে মেয়েদের মাতামাতির শেষ হচ্ছে না। ভবানীর টানেই যে ক্ষিতীশ ফিরে এসেছে এ তো শ্মশানে ক্ষিতীশেরই নিজ মুখের স্বীকার। আর স্বীকার না করলেও বা বুঝতে কার বাকি আছে? মাসাবধি কাল ক্ষিতীশের অসুখ, ডাক্তার-বদ্যি হদ্দ হয়ে গেছে, টোটকা-দৈবেও কিছু সুসার হয়নি, পীর আর সত্যনারায়ণ দুইই অগ্রাহ্য করলে। শেষ পর্যন্ত ভবানীই যমের পথ আটকালো এবং তাও কিনা বাড়ির বাইরে এক পা-ও না এগিয়ে। সাবিত্রীকে কাঙালের মতো অনেক দূর যেতে হয়েছিলো যমের সঙ্গে, বেহুলাকে ভেলা ভাসিয়ে স্বর্গের দুয়ার পর্যন্ত। আর, এ শুধু বললে, কার সাধ্য আমার স্বামীকে নেয়, আর, ভুল করে একবার গিললেও যমকে ফের ভয়ে-ভয়ে ফেলতে হলো উগরে। তাইতেই বৌ-টা কাঁদেনি, খুলে ফেলেনি গায়ের গয়না, কাল থেকে ওর পরনের শাড়িটা তাই অমন চটুকে। হর-ঘরণী সত্যিকারের ভবানী ছাড়া সে কী!

কিন্তু, যে যাই বলুক, খুব বিশ্রী লাগছিলো ভবানীর। অত্যন্ত যাচ্ছেতাই। যেন ট্রেন ধরতে না পেরে ইস্টিশান থেকে বিছানা-বাক্স নিয়ে বোকার মতো বাড়ি ফিরে আসা। কী লজ্জা! কী অপৌরুষ! বাজি ধরে টাকা না

দেবার মতো। বিতাড়িত হবার পরেও যেন ফিরে এসে ফের পায়ে পড়া। নিজেরই ভবানীর বার-বার মনে হতে লাগলো, এমন কখনো সে চায়নি, এর জন্যে করেনি সে এত সেবা এত প্রার্থনা। মুহূর্তে সে আবার বন্ধ হয়ে গেল, তার আকাশ আর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। ছাড়া পাখিকে হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে এসে খাঁচায় পুরলো। মনের মধ্যে আবার তার সীমানা পড়লো। ধারালো সরল রেখাটা বেঁকে দুমড়ে আস্তে-আস্তে দাঁড়ালো গিয়ে আগেকার নিরীহ বৃত্তে।

তবু যেটুকু লাভ। এই জমকালো সতীত্বগৌরব। ইনসিয়রেন্সের দুহাজার টাকার চেয়ে কম কী।

অম্বিকা ডাক্তার এমন চোটপাট করে বাড়ি ঢুকলো যেন সে-ই ঠেকিয়ে দিয়েছে এ-যাত্রা। বললে, 'কই, কেমন আছে এখন ক্ষিতীশ?'

ক্ষিতীশ ঘুমুবার চেষ্টা করছিলো অনেকক্ষণ থেকে কিন্তু বারে-বারেই ঢিল পড়ছিলো তার ঘুমের জলে। এখন তাদের বাড়িটা আর রোগীর বাড়ি নয়, যেন তীর্থক্ষেত্র। তবু আর সব সইলেও মর্চে-পড়া ভোঁতা সূঁচে অম্বিকা ডাক্তারের ইনজেকশান আর সইবে না। তাই বোঁজা চোখে শ্রান্ত স্বরে ক্ষিতীশ বললে, 'ওঁকে চলে যেতে বলো মা, আমার চিকিৎসার দরকার নেই। আমি বেশ ভালো আছি।'

'তা কখনো হয়?' হাসতে-হাসতে অম্বিকা ডাক্তার খাটের দিকে এগিয়ে এলো: 'চিকিৎসার সুযোগ যখন আরো কিছুকাল পাওয়া গেছে তখন সেটা অবহেলা করাটা ঠিক হবে না।'

'ঢের সুযোগ দেয়া হয়েছিলো আপনাদেরকে, আর নয়।' ক্ষিতীশের মা ঝাঁজিয়ে উঠলেন: 'কেন, কার তপস্যায় বাছা আমার জীবন ফিরে পেয়েছে তা আমরা জানি। তার জন্যে আপনাদেরকে আর বাহবা নিতে হবে না।'

'বলেন কী? ঠিক-ঠিক ঐ তিনটে ইনজেকশান পড়েছিলো বলেই ফিরে পেয়েছেন ছেলেকে!'

'আর এই যে তিরিশ দিন তিন থেকে তিরিশিটা করে ক্রমাগত ইনজেকশান দিচ্ছিলেন সেগুলো কি মোটেই ঠিক-ঠিক হয়নি ?' ক্ষিতীশের মা নিষ্ঠুরের মতো বললেন : 'আর দরকার নেই ছেঁড়াফোঁড়ায়। দয়া করে বাছাকে একটু শান্তিতে থাকতে দিন আপনারা।'

অম্বিকা ডাক্তার রাগে গলার রগ ফোলাতে-ফোলাতে চলে গেল।

বেলা তখন পড়ে এসেছে। ফ্যাকাশে চাঁদ তেজালো হয়ে উঠেছে আস্তে-আস্তে। 'বাড়ির মধ্যে গোলমাল আর ভালো লাগছে না, মা।' তেমনি দুর্বল শ্রান্ত গলায় ক্ষিতীশ বললে ভাসা-ভাসা তন্দ্রার মধ্যে : 'আমি এখন একটু ঘুমুব। ভবানী কোথায় ? ভবানীকে ওরা এখন ছেড়ে দিক।'

কিন্তু ভবানীকে ওরা না সাজিয়ে কেউ ছাড়বে না। ভবানী মিষ্টি-মিষ্টি করে হাসছে। ওর যেন আজ নতুন করে ফুলশয্যা। তা একরকম মিথ্যে নয়। দুএকটা পাতি-গাঁদা ক্ষিতীশের সঙ্গে চলে এসেছে বিছানায়।

মেয়েরা অনেকে তাকে রেঁধে পাঠালে। সমস্তই মাছের। ভবানী হাসে আর গন্ধে তার গা গুলোয়। কত দিন ধরে তার গলা দিয়ে কিছু তলায়নি, আর আজ প্রথমেই কিনা এই কেলেঙ্কারি। একটু রইতে-সইতেও দেবে না ? এক রাত্রেই সমস্ত ?

ক্ষিতীশের মা ভবানীকে আবার তাড়া দিলেন। পানের বোঁটায় করে চুন নিয়ে জিভের ডগায় ঠেকিয়ে ভবানী বললে, 'যাই, মা।'

এর আগেও দুএকবার ঘরের মধ্য দিয়ে হাঁটাফেরা করেছে ভবানী, দেখে গেছে ক্ষিতীশকে। এই এখন, এতক্ষণে, স্বামীর সঙ্গে তার নিভৃত হবার সময়। অনেক দিন পরে বিদেশ থেকে স্বামী ফিরে এলে মিলনের পূর্ব-মুহূর্তে স্ত্রীর যেমন কুণ্ঠা আসে, একটু বা ভয়-ভয় করে, ভবানীরও তেমনি করতে লাগলো এখন। কিন্তু কুণ্ঠার কিছুই নেই। যা ঘটছে ঘটুক, আর যা ঘটেনি তা না-ই ঘটুক—ভবানী মন ঠিক করে ফেলেছে।

দেখতে রাত মোটে দশটা, কিন্তু শুনতে অত্যন্ত গভীর। এ নিস্তব্ধ

গম্ভীরতার সঙ্গে ভবানী কয়েক দিন থেকেই পরিচিত। থেকে-থেকে শুধু একটা ভুতুমের ডাক শোনা যাচ্ছে। কয়েকদিন থেকেই যাচ্ছিলো।

পানের বোঁটাটা আরেকবার লেহন করে স্বামীর সঙ্গে আজ কী নিয়ে সংক্ষেপে পরিহাস করা যায় তাই ভাবতে-ভাবতে ভবানী ঘরে ঢুকলো। ঘরে ঢুকে বাইরের দরজায় হুড়কো দিলে। পাশের ঘরে যাবার ভিতরের দরজাতে হুড়কো দিতে গিয়ে দেখলো সেটা আগে থেকেই বন্ধ। অবাক লাগলো একটু। ভাবলো, মা কিম্বা আর কেউ হয়তো ভিতরের দরজাটা আগে বন্ধ করে বাইরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছেন। ক্ষিতীশ তো শোয়া, জোরে-জোরে নিশ্বাস ফেলে ঘুমোচ্ছে অঘোরে।

হঠাৎ ঝপ করে বাতিটা নিবে গেল। ঝপ করে, কেননা মনে হলো কে যেন হাতের থাবড়া দিয়ে নিবিয়ে দিলে। চমকে উঠেছিলো ভবানী, প্রদীপের বুক পুড়ে যাচ্ছিলো হয়তো, তাই অমনি শব্দ করে নিবে গেল। ইদানি প্রদীপের আলোই বেশি পছন্দ করছিলো ক্ষিতীশ। এখন বাতিটা নিবে যাওয়াতে স্বামীর সঙ্গে ভবানী একটি শান্ত নৈকট্য অনুভব করলো। ঘর এখন জ্যোৎস্নায় ভরে ওঠবার কথা, কিন্তু ঠাণ্ডা বলে বেশির ভাগ জানলাই বন্ধ। ঘরের মধ্যে শুধু একটা ঠাণ্ডা আবছায়া।

তবু, নিজেকে তখন কেমন দেখাচ্ছে দেখবার জন্যে ভবানী একবার আয়নার কাছে এসে দাঁড়ালো, হয়তো নিজেরও অলক্ষ্যে। এত রাতে ঠাট করে কখনো সে নিজের মুখ দেখে না, তবু আজ যেন না দেখলেই নয়। আয়নাটা টাঙানো উত্তরের দেয়ালে, সোজাসুজি খাটের ছায়া পড়ে খানিকটা। আয়নার কাছে এসে দাঁড়াতেই ভবানীর নজরে পড়লো ক্ষিতীশ যেন দুই চক্ষু মেলে তাকে দেখছে, চোখের মধ্যে কালোর চেয়ে সাদার ভাগই বেশি। উনি কি তবে ঘুমোননি? চমকে পিছন ফিরে চাইলো ভবানী। ভাবলো, যেমন ভাবে বিছানা করা, তাতে কি আয়নায় ক্ষিতীশের মুখের ছায়া পড়ার কথা?

...। খাটের দিকে এগিয়ে এলো। মশারিটা এখন ফেলে ...ত হয়। কিন্তু খাটের কাছে এসে দাঁড়াতেই ভবানীর সমস্ত শরীর লোহার মত শক্ত হয়ে গেল। এ কী ! এ কে ? এতক্ষণ এরা সবাই দেখেনি একে ? এ যে অন্য লোক। স্পষ্ট অন্য লোক। এ কাকে এরা নিয়ে এসেছে শ্মশান থেকে ?

ভবানীর গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরুবার আগেই ক্ষিতীশ বিছানার উপর উঠে বসলো। এতদিনকার মরন্ত রুগীর এ কী অসম্ভব ব্যবহার ! ক্ষিতীশ প্রায় নামতে চেষ্টা করলো খাট থেকে। অভ্যাসবশতই হবে হয়তো, ভবানী তাকে সামান্য বাধা দিতে এলো ; বললে, 'ও কি, কোথায় যাচ্ছ ?'

ক্ষিতীশ বললে, 'আমাকে একটু জল দিতে পারো ?'

'জল ? খাবে !'

'না, দাড়ি কামাবো।'

'দাড়ি কামাবে ?'

'হ্যাঁ। অনেক দিন ধরে দাড়ি রেখেছি বসে-বসে। দাড়ি না কামালে তুমি আমাকে চিনতে পারবে না।' বলে ক্ষিতীশ হাসলো।'

ভবানীর হাড়ের মধ্য দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে গেল এক ঝলক। না, দাড়ি না কামালেও চিনতে পেরেছে। এককালে সন্নেসি হবার ওজুহাতে সেও দাড়ি রেখেছিলো। বগুড়ায় একদিন দেখেছিলো তার জানলা থেকে।

'কী, পেরেছ চিনতে ? কত দিন ধরে চেষ্টা করছি তোমার কাছে আসবার জন্যে।' স্পষ্ট সতেজ দাঁতে ক্ষিতীশ হাসলো। ভবানীকে ধরবার জন্যে বাড়িয়ে দিল একখানা হাত। আঙুলগুলো শীর্ণ ও দুর্বল নয় মোটেই। ভয়ে পিছিয়ে গেল ভবানী। তার পান-ঠাসা মুখে কথা এলো জড়িয়ে। বললে, 'এ কী ? তুমি—তুমি বিজয় ? তুমি তো মরে গেছ।'

'মরে গেছি। কিন্তু বেশি দিন নয়। বছর দুই হবে, না?' বিজয় নেমে দাঁড়ালো খাট থেকে; 'কিন্তু কী ভাবে মরেছি জানো?'

উঃ, তা মনে করাও যায় না! ভবানী চোখ বোঁজবার চেষ্টা করে চোখ আরও মেলে রইলো। বাইরের জ্যোৎস্না একটু দেখতে পেলেও হয়তো তার এমন করতো না এখন—একটা কোনো গাছ, কোথাও বা একটু আলো। সমস্ত ঘর বন্ধ, অন্ধকার। তার গলা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে, বন্ধ হয়ে গেছে শরীরের সমস্ত চলাচল। উদ্‌ভ্রান্ত চোখ দুটো শুধু খোলা।

'গলায় দড়ি দিয়ে' বিজয়ই ফের বললে, 'কিন্তু কী ভাবে—'

শুনেছে ভবানী। ঘরেব সিলিঙে কড়া ছিলো না ঝোলবার। তাই জল ঢেলে ঘরের মেঝেটা ভীষণ পিছল করে রেখে জানলার শিকের সঙ্গে গলার দড়ি বেঁধে নিজকে ছেড়ে দিয়েছিলো। যদিও পা পৌঁছোচ্ছিল এসে মেঝেয় তবু পিছল বলে আশ্রয় পাচ্ছিলো না। এমনি ভাবে নিষ্ঠুর টানা-হ্যাঁচড়া করে সে নিজের প্রাণটাকে বের করে নিয়েছে।

'সেই থেকে এখানটায় বড়ো যন্ত্রণা।' বিজয় তার গলায় একবার হাত বুলোলো। ভবানীর দিকে আরো কিছুটা এগিয়ে এসে গাঢ় অন্তরঙ্গতার সুরে বললে, 'আমার বড়ো সাধ ভবানী, তুমি আমার এই যন্ত্রণাটা বোঝ। কেনই বা বুঝবে না? কত দিন কত সুখের ভাগ তুমি নিয়েছ, এই ভাগটাই বা নেবে না কেন?' বলে দুই হাত বাড়িয়ে বিজয় ভবানীর গলা টিপে ধরলো। অত্যন্ত আস্তে-আস্তে, পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে। ভবানীর মুখের পান মুখের মধ্যেই থেকে গেল।

সকাল বেলা ঘরের দরজা ভেঙে সবাই দেখলো ক্ষিতীশ মরে আছে তার খাটে আর ভবানী মরে আছে মেঝের উপর। বাগচি-গিন্নি রাজযোটককে আজ আর রাজ্য-টক বলতে পারলেন না।

প্রায় এগারোটার সময়েই শব রওনা করানো হলো। সেই সব শ্মশান-যাত্রীরাই এলো বহন করতে। সমস্তই আগের মতো। তেমনি করেই

রাখা হলো খাট অশ্বত্থ গাছের তলে। নির্দিষ্ট সময়েরও বেশি অপেক্ষা করা হলো। কিন্তু কিছুই আজ নড়লো না আপনা থেকে।

'আজ আর কখনো হয়? আজ মা যে সঙ্গে গেছেন।' বলাবলি করতে লাগলো মেয়ের দল: 'বৈধব্যযন্ত্রণা এক মুহূর্তের জন্যও সইবে না বলেই তো স্বামীকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। আজ একসঙ্গে চলে গেলেন বৈকুণ্ঠে।'

পাশাপাশি চিতায় শোয়ান হলো। গ্রামের লোক চাঁদা করে কাঠ আর ঘি যোগাড় করলে। কাতারে-কাতারে লোক দাঁড়িয়ে গেল শ্মশানে। ভবানীর সুনাম বাড়লো বই কমলো না।

